একটি চড়ুই পাখি ও কালো মেয়ে

সমস্তটাই চোখেব উপব ঘটছিল, আনন্দ চোখ মেলে দেখাব জন্যই দেখছিল। সেই চোখ চাওযা অবস্থাতেই চোখেব উপবেই কি এসে পড়ল ঝপ কবে। ঠিক নাক এবং ডান চোখেব সংযোগস্থলে। বেশ বড একটা কিছু। তাতে যেন কাটা আছে। এবং সবেগে এসে পড়ল। কযেকটা কাঁটা যেন চোখে বিঁধে গেল আনন্দেব। পিন কুশনেব মতো একটা জিনিস—পিনেব ডগাগুলি যেন বেবিয়ে আছে। আনন্দ আকস্মিক আঘাতে শুধু চমকেই উঠল না, একটা ক্রুদ্ধ এবং কাতব চিৎকাব কবে উঠল—ওঃ!

ববিবাব দিন বিকেল বেলা, প্রায পৌনে চাবটে। চৈত্রমাসেব মাঝামাঝি, শীত গেছে, গবমেব আমেজ উঠেছে, দুপুবে ঘুমুতে ভাল লাগছে কিন্তু বৌদ্রে জ্বালা বা তাপ এখনও ফোটেনি। তবুও গ্রীষ্ম দুপুবে যে একটা থমথমে ভাব ওঠে সেটা দেখা দিযেছে, সেইটে কাটছে এখন। পাখিগুলো বাইবে কলকল কবতে শুরু কবেছে, দুপুবেব ঝিমুনি কাটিযে উড়তে শুরু কবেছে। ইলেকট্রিকেব তাবেব উপব কযেকটা কাক তাবস্ববে কা কা ডাক ধবেছে। কযেকটা শালিক কিচিবমিচিব কবছে। আব চড়ুইযেব দল ফুব ফুব কবে উড়ছেই উড়ছেই।

কলকাতাব বাইবে আগে শহবতলী বলা চলত, কিন্তু এখন শহবেব সামিলই। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টেব নতুন স্কীমে নতুন শহবই গড়ে উঠেছে, মাঝখানে একটা পার্ককে বেড় দিযে মসৃণ বাস্তাব পাশে পাশে নতুন বাড়ি। বালিগঞ্জ বাসবিহাবী অ্যাভিন্যুব মতো সবগুলোই বড় বাড়ি নয, ছোট বড় মাঝাবি একতলা ছোট বাড়ি থেকে চাবতলা বাড়ি, খান দুই পাঁচতলা বাড়িও উঠেছে। এবই মধ্যে ছোট একখানা একতলা বাড়িব ভাড়াটে আনন্দ। বাড়িটা একতলা এবং ছোট হলেও ফ্যাশনে কাযদা কবনে খাটো নয। সব থেকে বিশেষত্ব বাড়িটাব জানালা। আটফুট চাবফুট একটা জানালা দক্ষিণেব দেওয়ালে এবং তাবপবই পচিশ ফুট বাস্তা, তাব ওপাবে পার্ক। পার্কেব চাবিদিকে দেবদাক গাছেব সাবি। দু' চাবটে শিমূল জাতীয গাছ। সব মিলযে শহব এবং পল্লীব মুক্ত আকাশ ও মাটিতে গাছপালাব মধ্যে প্রকৃতিব সঙ্গে একটি মেশামেশি আছে। গাছপালাব মধ্যে পাখি—সে শকুন থেকে চড়ুই পর্যন্ত। কীটপতঙ্গও যথেষ্ট। মশাব তো কথাই নেই, বাত্রিকালে মধ্যে মধ্যে ভোঁ কবে গুব্‌বে পোকা ঘবে ঢুকে মাথা ঠুকে ঠক কবে মেঝেয যখন পড়ে তখন আনন্দকে চমকে উঠতে হয। এ পর্যন্ত দু'খানা ছবি তাব একদম বববাদ হযে গেছে। চমকানিতে হাতেব তুলি লাফিযে এমন বেমক্কা বঙেব টান মেবে দিলে যে—তাকে আব কিছুতেই শোধবানো গেল না। শোনা যায সাপও আছে। কোণে—অর্থাৎ ঘবেব কোণে ব্যাঙ তো আছেই। আকাশে

মেঘ হলেই কোণ থেকে কর্‌র্ শব্দ করে ডেকে ওঠে। রাত্রে পাশের ফ্যাক্টরির কোন অজ্ঞাত স্থান থেকে শেয়াল ডাকে নিত্য নিয়মিত।

আজ বিকেলে একটু সকাল-সকাল ঘুম ভেঙে উঠেছিল আনন্দ। কমার্সিয়াল আর্টিস্ট আনন্দ কাল শনিবার কাজ করেছিল। রবিবার ও ঘুমোয়, আজ ভেবেছিল বেশি করে ঘুমুবে। ঠিক করেছিল সন্ধ্যাতেও আর বের হবে না। কিন্তু তবুও ঘুম ভাঙল সকাল-সকাল। ঘুমের মধ্যে একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেছে। কাল বিকেল বেলা মিশন রোয়ের একটা আপিসে গিয়েছিল, সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যু আর মিশন রোয়ের জংশনে তখন ট্রাফিক জাম হয়ে গেছে। সে আর প্রায় নড়ে না। সে যাচ্ছিল ট্যাক্সিতে। বড়বাজার থানার পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা কাপালীটোলার সঙ্গে মিশেছে, সেই রাস্তা ধরে বেরিয়ে এসেছিল একটি মেয়ে। ফিরিঙ্গি মেয়ে। হাঁটুর উপরে ওঠা খাটো ফ্রক, মুখে ব্রণ, সে ব্রণগুলো রঙেও ঢাকা পড়েনি। বগলে ভ্যানিটি ব্যাগ, হাতে সিগারেট। বেশভূষায় রকমে অশ্লীলতাকে সযত্নে ফুটিয়ে তুলেছে এবং সেটা তার বড় বড় চোখ আর এলোমেলো ঝাঁকড়া চুলের জন্যে অত্যন্ত খাপ খেয়েছিল। নিজে আর্টিস্ট আনন্দ, সে বলতে পারে—এ ছেড়ে অন্য যে কোন রকম মেক-আপ হোক, ওকে এর থেকে ভালো মানাতো না। সে দামী ঝলমলে হলেও না। সুশীলা সাজে মনে মনে ওকে সাজিয়েও আনন্দ দেখেছে, কিন্তু তার থেকে করুণ ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না—এটা সে নিশ্চয় করে বলতে পারে। সংসারে প্রত্যেক মানুষের একটা করে স্টাইল আছে; এইটেই ওর স্টাইল। আনন্দ কপাল কুঁচকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আপনার মনেই কতকটা স্থান-কাল বিস্মৃত হয়েই, মৃদুস্বরে বলে উঠেছিল—হুঁ! মেয়েটা শুনতে পায়নি নিশ্চয়, কিন্তু ড্রাইভারটা পেয়েছিল। বুড়ো শিখ ড্রাইভার। সেও মেয়েটাকে দেখছিল, আনন্দের ছোট্ট 'হুঁ' শব্দটি শুনে তার দিকে তাকিয়ে বেশ গম্ভীরভাবেই বলেছিল, চৌরঙ্গি যাতি হ্যায়! ঠিক সেই মুহূর্তে মেয়েটা সিগারেট টেনে উপর দিকে মুখ তুলে সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে দিয়েছিল; সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলোতে ঝড়ো হাওয়ায় আমেজ লাগিয়ে ওই জাম ট্রাফিকের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে গাড়িগুলোকে পার হয়ে ওপারে উঠে আর একবার ধোঁয়া উড়িয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। এবার ধোঁয়া ছেড়েছিল জাম ট্রাফিকে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোর দিকে। ট্যাক্সি প্রাইভেট বাস লরীগুলো তারস্বরে হর্ন দিচ্ছিল; বোধ করি তাদের মুখেই ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে মেয়েটা ব্যঙ্গ করে গেল।

আনন্দ সকৌতুকে মৃদু শিস দিয়ে উঠেছিল।

বুড়ো শিখও হেসে বলেছিল, বহুত্ মজেমে হ্যায়।

আনন্দ আর কথা বলবার সময় পায়নি। সামনে একখানা বাসে এবং একখানা প্রাইভেটে কাছ ঘেঁষে এসে গায়ে গায়ে লাগিয়ে এমন একটা তীক্ষ্ণ যান্ত্রিক শব্দ তুলেছিল যে, চমকে উঠেছিল সে। প্রাইভেটখানার বাঁ দিকে মাডগার্ড চড় চড় শব্দে ছেড়ে গেল। মনটা চলে গেল ওইদিকে।

এবপব আব মনে হয়নি মেয়েটাকে। এবপব সে মিশন বোয়ে যে আপিসে কাজ ছিল সেখানে গেছে, তাবপব সন্ধ্যাতে তাদেব আড্ডায় গেছে। আড্ডা মানে একটা নিবিবিলি বাব। সেখানে তাদেব সমাজেব—হ্যাঁ সমাজ ছাড়া আব কি বলতে পাবে—আর্টিস্ট জার্নালিস্ট সাহিত্যিক সিনেমা পাবলিসিটিব লোক এবা মোটামুটি এক গোষ্ঠী না হোক এক সমাজ, এদেবই কিছু লোক—এক্ষেত্রে এক গোষ্ঠী বলা যায়—তাবা এসে জমে। আড্ডা মদ্যপান একসঙ্গে চলে। মদেব গ্লাসেব টুং টাং শব্দেব সঙ্গে বসিকতাব প্রতিযোগিতায় তাবই মধ্যে মাঝে মাঝে প্রাণেব কথা—সব নিয়ে চমৎকাব জমে ওঠে। আব'ব ওই গোষ্ঠীব মধ্যে থেকে ছোট ছোট দল—বাত্রিব সঙ্গে দানা বাধে। তাবপব দলগুলি খসে। এমনি এক দলে পড়ে কাল এবপব হৈ হৈ কবেছে বাবোটা পর্যন্ত। চুম্বক অবশ্যই ছিল। স্বজাতীয়া অর্থাৎ বাঙালিনীব নৃত্য—কোন এক গুপ্ত বাবে। এব মধ্যে এই মেয়েটা যেন আসেইনি। একবাব আধবাব চকিতেব জন্যে ওব দূববর্তিনী সেই ট্রাফিকেব দিকে দেখা ছাড়া ছবিটা যেন ধোঁযা ছেড়েই পিছন ফিবে ভিড়ে মিশিয়ে গিয়েছিল। বাত্রে বাড়ি ফিবতে একটা হয়েছিল। এসেই শুয়ে পড়েছিল। চাকব জানে - শনিবাব বাবু বাড়িতে খায না, সে খেয়ে দেয়ে শুয়েছিল—আনন্দ চাবী খুলে ঘবে ঢুকেছিল। ঘুম আসতে দেবি হয়নি। গাঢ় ঘুম ঘুমিয়েছে। বাত্রেও ঘুমেব মধ্যে সে স্বপ্ন দেখেনি। কিন্তু দুপুববেলা স্বপ্ন দেখলে এবং সাড়ে তিনটে হতে হতে তাব ঘুম ভাঙল। প্রথমেই মন বলেছিল—বেবিয়ে পড়। থানাব পাশে বাস্তাটাব মোড়েব মাথায় দাড়িয়ে থাকলেই দেখা মিলবে। কিন্তু শবীবটা কেমন যেন ভাবী মনে হলো—যে মুহূর্তে তাব মনে পড়ল যে, কাল যা পেয়েছিল সবই প্রায় শেষ কবেছে কাল। বাড়িতেও টাকা নেই। আজ ববিবাব ব্যাঙ্কও বন্ধ। শুধু ব্যাঙ্ক নয়—সব আপিসই বন্ধ। এসে সে দাঁড়িয়েছিল আটফুট বাই চাবফুট জানালাটাব সামনে।

চৈত্রমাসেব সাড়ে তিনটে। বোদ প্রসন্ন। তাত নেই। পার্কেব গাছগুলোব উপব পড়েছে পশ্চিমদিক থেকে। পার্কটাব চাবদিকে বাস্তা। ওপাবেব বাস্তায় ওয়ানওয়ে কটে শহবেব যত উত্তবমুখী গাড়িগুলো যায়। সাব সাব প্রাইভেট কাব, ট্যাক্সি, বাস, লবী ঝকে ঝকে ছুটছে। কিছুটা পবে পবে মুখে যেমন যেমন ট্রাফিক ছাড়ছে তেমনি এক এক ঝাক গাড়ি চলছে। চোখ তাব সেইদিকে পড়ল। কিন্তু মন তাব খুত খুত কবছে। যাওয়া হবে না? মেয়েটা [illegible]। একবাব গিয়ে আজও শুধু ওকে দেখে এলে কি হয়? কিন্তু [illegible]। না। পকেটে টাকা না থাকলে অস্বস্তি অনুভব কবে আনন্দ। চাকবটাব কাছে আব কত টাকা পাওয়া যেতে পাবে? এই তো সাতদিন আগে [illegible] তাকে দিয়েই মনিঅর্ডাবেব ফর্ম লিখিয়েছে। চাল্লিশ টাকা বাড়ি পাঠিয়েছে [illegible] পঁয়ত্রিশ টাকা। কড়াও পাচ টাকা। বাজাব খবচ, নিত্য খবচ থেকে [illegible] [illegible] [illegible] পাব যে [illegible] এবপবও ওব হাতে বিশ পচিশ টাকা [illegible]

থাক [illegible]। [illegible] আগামী কাল। আগামী কাল। সেই চুম্বকে চুম্বকে

অ্যান্ড টুমরো। এপারে তার বাসাটার ধারের রাস্তাটা নির্জন। বাড়িও কম। এপথে গাড়ি নেই। এখন সাড়ে তিনটেতে লোকজনও নেই। চৈত্রমাসে দেবদারু গাছগুলোর সব নতুন পাতা। কাঁচা সবুজ। বাতাসে দুলছে আর রোদের ছটায় পাতার কাঁচা রঙের পালিশ থেকে কাঁপানো ছটা বাজিয়ে ঝিলিকের একটা ঝিলিমিলি—ঝিকিমিকি তুলেছে। কয়েকটা শিমূল জাতীয় গাছের পাতা ঝরে গেছে নিঃশেষে। শুকিয়ে যাওয়া মতো ডালগুলোয় বড় বড লাল ফুল ফুটেছে। ক'টা কাক পথে নেমেছে, রাস্তার উপর থেকে কিছু খুঁটে খাচ্ছে। ও—। বেলা দশটা নাগাদ ফুটো ময়লা ফেলা গাড়িটা গেছে রাস্তার উপর দিয়ে মযলার ছড়া ছড়িয়ে। ক'টা চড়ুই পার্কের ধারে রাস্তার পাশে ধুলোস্নান করছে। কলকল কচকচ করে ঝটপট করে মারামারি করতে করতে চার-পাঁচটা শালিক উড়ে যাচ্ছে। দুটোয় জড়াজড়ি করে ধপ করে মাটিতে পড়ল। চড়ুইগুলো আশেপাশে কোথায় অজস্র ক্রিচ-ক্রিচ ক্রি-র্-র্ র্, ক্রি-র্ র্-র্ঁ করছেই করছে। চীনে চড়ুই নির্বংশ করেছে। এখানে করে না? মার্ক্সিস্ট সে নয়। কম্যুনিস্টদের প্রেমেও সে পড়েনি, কিন্তু চীনের এইটেই তার ভাল লাগে।

কম্যুনিস্ট সে নয, কোনও বাদ বা বাদানুবাদের ধাব সে ধাবে না। এখানকাব কম্যুনিজমকে সে বাদ বলে না—বলে অনুবাদ। সেই হিসেবে সে বলে—ও সব বাদানুবাদে আমি নেই। তবে চীন রাশিযাকে তারিফ করি—-তাব কারণ তারা ঈশ্বর নামক কল্পনাটিকে ধুয়ে-মুছে দিযেছে। জীবনের সমস্ত পথে বাধা ওই কল্পনার প্রস্তরখণ্ড! আর চীনকে তারিফ করি তারা চড়ুই আর মাছি নির্মূল করেছে বলে।

অকস্মাৎ একটা কাক একটা বড দেবদারু গাছেব মাথা থেকে ছোঁ মারলে! এঁকে-বেঁকে আশ্চর্য গতিতে ছোঁ মারা ওদের। একটা চড়ুই—! সেটাও আশ্চর্য গতিতে ছোট দেবদারু গাছটাব পত্রপল্লবেব ভিতরে জলের মধ্যে মাছের মতো পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কাকটা গতিবেগ সামলাতে এসে ইলেকট্রিক তারের উপর বসল।

পার্কটার ভিতরে কর্পোরেশনেব ছোট অফিসটার ওখানে একদল ঝাড়ুদার জমেছে। গোলমাল করছে। ওধারে বাস চলা ওযানওযে বাস্তাটায একটা বাস লম্বা একটা ক্যা-চ শব্দ তুলে ব্রেক কযে দাঁড়াল। পিছনে সারিবন্দী গাড়ি।

শিমূল জাতীয় পত্রহীন ফুল-ফোটা গাছটায কয়েকটা ছেলেমেযে ঢেলা ছুঁড়ছে ফুল পাড়বে। বাচ্চা ছেলেমেযে। আজ রবিবার বিকেলে পার্কে বেশ ভিড হয়। পার্কটার একদিকে খানিকটা মেয়েদের জন্যে নির্দিষ্ট। হবেক রকম সাজে-গোজে সেজেগুজে মেযেরা আসবে। কত রকম কাপড়পবা সত্তব বছরের বৃদ্ধা থেকে প্রৌঢ়া যুবতী কিশোরী বালিকা। নানারকম পোশাক—নানান খোঁপা—চুল বাঁধা—নানান চেহারা। এক প্রৌঢ়া আসেন—তিনি নিত্যই আসেন—কারণ যেদিনই আনন্দ বিকেলে বাসায় থাকে সেইদিনই সে তাঁকে দেখে—নাতি-টাতি জাতীয় একটি শিশুকে কোলে নিয়ে পার্কে ঢুকছেন। তাঁর সাজসজ্জা, কেশ পারিপাট্য দেখে সে চমৎকৃত হয। মুখে পাউডারের পাফ না থাক স্নো-ঘষা হাত যে মুখে বুলোন তাতে সন্দেহ নেই। এককালে সুন্দরী

ছিলেন। ও দেখে আনন্দ স্পষ্ট বুঝতে পারে—মহিলাটি মনে মনে আজও যৌবন বনে বিচরণ করেন। কৌতুক অনুভব করে সে।

সেদিন বারের আড্ডায় এক অনতিক্রান্তযৌবনা সমাজ-রমণী জাতীয় একটি মেয়েকে দেখে তাব এক বন্ধু বলেছিল—চেন ওকে? ওই যে রূপালি চুলিনী সিগারেট পাইপহস্তা? উনি স্বনামধন্যা—।

আনন্দ বিস্মিত হয়েছিল বিখ্যাত মহিলাটির নাম শুনে। অবশ্য তিনি বারে বসেননি, তিনি একটা সেলুন থেকে বেরিয়েছিলেন। আনন্দ সেই কথার সূত্র ধরে এই মহিলাটির কথা বলেছিল।

বন্ধু বলেছিল—তুই বীটনিক না অ্যাংরি ইয়ংমেন রে?

—কেন?

—যে ভাবে দুনিয়াকে দেখছিস, বিচার করছিস—তাই বলছি।

সে বলেছিল—যা বল। তবে আমি নিজে দুটোর একটাও নই। আমি আনন্দ রায়। আমি ইস্কাপনকে ইস্কাপনই বলি। সে বিবি হলেও খাতির করে মুখের চারিপাশে লাল শেড দিই নে। কিংবা মুখে ইন্ডিয়ান রেজ লাগাইনে। আইভরি ব্ল্যাক ব্যবহার করি। সেক্স সত্য, মানুষ যত সত্য তত সত্য। এটা আমি জানি এবং মানি, কারণ আমি একজন মডার্ন মনুষ্য। এবং আমি নারীজাতিকে ভয়ও করিনে বা তার পশ্চাতেও উন্মত্তবৎ ছুটিনে। সংসারে নারীজাতির মধ্যে একটি নারী আছেন যিনি আমার মা। ভগ্নী নেই। বাকি নারীজাতিকে ভাগ করি বৃদ্ধা প্রৌঢ়া যুবতীর মধ্যে। তাঁরা সবাই নারী। তাঁদের দেখি রূপ, দেখি ব্যবহার, বিচার করি। যিনি লভ্যা তাঁকে রুচিতে না বাধলে লাভ করতে চাই। কিন্তু প্রেম করে নয়—বিনিময়ে। তবে কেউ যদি সাময়িক প্রেমে বিশ্বাস করতে পারেন তার সঙ্গে সাময়িক প্রেমেও আমার বাধা নেই।

বন্ধু বলেছিল—বাপ্‌স্। তুই তো লীডার রে বাবা—

—নো। সহস্রের মধ্যে বলব না—তবে আমি শতজনের একজন। তুমিও তাই। ও-ও তাই।

—গুড। উই আর অল বার্ডস অফ দি সেম ফেদার।

সে বলেছিল—উই আর অল ক্রোজ। কাক পক্ষী। কারণ কাকই সব থেকে বেশি এবং সাধারণ। এবং কাকদের কোনও বিষয়ে কোনও প্রেজুডিস্ নেই। এবং দারুণ ঐক্য তাদের মধ্যে। শালিকও কমন—কিন্তু শালিক আমরা নই, কারণ তারা বড্ড বেশি কলহ মারামারি করে—যা আমরা করিনে।

কাক-চরিত্র সে ছেলেবেলা থেকেই জানে। কিন্তু এখানে এসে অবধি এই পার্কটার জন্য এবং এখানকার খোলা ড্রেনের জন্য কাকেদের আধিক্য হেতু কাক-চরিত্র আরও ভাল করে অধ্যয়ন কবতে পেবেছে।

থাক। আজ কাক-চরিত্র আর নারীচিত্র দেখেই বিকেলটা কাটুক। না। দেবদারুর কচি পাতায় পড়ন্ত সূর্যের আলোর খেলাটা হঠাৎ যেন মনোহারিণী হয়ে উঠল। বাঃ!

পশ্চিম আকাশে মেঘ ছায়া ফেলেছে। তাইতে শেড পড়েছে। প্রদীপ্তবর্ণা আলো এই ছায়ায় উজ্জ্বল শ্যামাশ্রী হয়ে উঠেছে।

খিল খিল হাসির শব্দে নির্জন পথটা চমকে জেগে উঠল। নারীকণ্ঠ।

আলোর রূপ আছে—কিন্তু কায়া নেই; কায়ার আকর্ষণ আছে। সে চোখ ফেরালে। হুঁ। আরম্ভ হলো নারী অভিযান। একদল মেয়ে—সম্ভবত একই বাড়ির—আসছে। সে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত। সপ্তরথিনী না সপ্তসমুদ্র! না, সমুদ্র নারী নয়। চারটি যুবতী—তার মধ্যে একটি বিবাহিতা। মাথায় ডোনাল্ড খোঁপা। তিনজন বিশ থেকে ষোলর মধ্যে ডবল বেণী সিংগল বেণী এলো খোঁপা বাঁধা। তিনটির দুটি বালিকা—একটি বছর তিনেকের। ওদের ববছাঁটা চুল।

—বাবু! চা করব?—হরিয়া চাকর।

—নিশ্চয়।

—রাত্রে?

—বাড়িতে খাব। নিরিমিষ। বুঝলি?

—হুঁ।

ছাতা—লেডিজ ছাতা আসছে! এ দল পার হয়ে গেল প্রায়। কিন্তু আনন্দের সব ঔৎসুক্য ধাবিত হলো ছাতার দিকে। ছাতার দিকে নয় ছত্রধারিণীর দিকে।

দীর্ঘাঙ্গ সুকৃষ্ণা। মানে সুন্দর কৃষ্ণা। আনন্দ রায় এই পাড়ায় নতুন এসেছে। মাসখানেক। মেয়েটি ঘড়ির কাঁটার মতো সকালে একবার বিকেলে একবার এমনই ছাতায় নিজের মুখ ঢেকে চলে যায়। পার্কের যাত্রিনী ও নয়। মুখ ঠিক দেখেনি তবে দেখেছে ওর কালো রঙ আর কালো চুল। একরাশি কালো চুল, এবং সে কেশরাশির ওর দীর্ঘাঙ্গীত্বের সঙ্গে সমতা রেখে দীর্ঘ। হয়তো একটু বেশি। কোমর ছাড়িয়েও নিচে নেমে থাকে। এই বিশেষ সৌন্দর্য-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মেয়েটি সচেতন—স্যাম্পু করে খুলেই রাখে। ক্বচিৎ দেখা যায় মুক্তকেশী কৃষ্ণার পটভূমি কৃষ্ণ মেঘমালা আজ দুলছে না, ফুলছে না। আর একটি বিশেষত্ব ওর হাঁটার ভঙ্গি। দীর্ঘাঙ্গীদের পায়ের দিকটাই দীর্ঘতর হয়, সুতরাং পদক্ষেপ স্বাভাবিকভাবে হওয়া উচিত দীর্ঘ। কৃষ্ণা কিন্তু দীর্ঘ পায়ে খাটো খাটো করে খুব দ্রুত ছন্দে চলে। তাতে একটি নৃত্যভঙ্গির সৃষ্টি হয়। মেয়েটির নাচ জানা শিক্ষিত।

ময়নাপাড়ার মাঠে মেঘ এলে কালো মেয়ের মতো আকাশের দিকে চেয়ে বারেক তার দিকে তাকিয়ে গাইটিকে ডাকবার জায়গাও এ নয়, কথাও ওর অবশ্যই নয়—কিন্তু কোনওদিনই কোনও কারণে ছাতাটিকে সোজার বদলে ঘাড়ে ফেলে আকাশের দিকেও তাকালে না, কোনও ভাই-বোনকেও ডাকলে না, তার দিকেও তাকালে না। ওর চোখ কালো হরিণ চোখ কি না সে দেখা আনন্দের আর হলো না। মধ্যে মধ্যে মনে হয় দেখলে ছবি এঁকে কোনও কালিওয়ালা কোম্পানিকে বেচে আসতে পারত। ক্যাপসন দিত—'যতই কালো হোক্'। উঁহু। ক্যাপসন দিত—'চিকন ছাঁদে লেখা আমার এমনই কালো হোক্'।

অবশ্য ঔৎসুক্য থাকলেও মনোযোগ আকর্ষণেব কোনও চেষ্টাই কোনওদিন কবেনি আনন্দ। ওব নিজেবও যে সে মাঠ চাই। আনন্দেব সে মাঠ চৌবঙ্গীপাড়া। আজ কিন্তু ইচ্ছে হলো সজোবে 'হবিযা' বলে চিৎকাব কবে ওঠে। না, থাক। ছত্রধাবিণী চলে এসেছে তাব জানালাব সামনে। হাতেব কনুই আব সঞ্চবমান পাযেব পাতা দু'খানিব অগ্রভাগ ছাড়া আব কিছু দেখা যায না। সাদা কাপড। একহাতে ছাতা, অন্য হাতে খাতা বা বই। কাজেই কনুই ছাড়া গোটা হাত দু'খানাও দেখা যায না। ব্লাউজটা উজ্জ্বল জবদা বঙেব।

আবে! কি হলো ? একটা কাক ছো মেবে নেমে এসেছে ওব ছাতাব উপবে! কি কাণ্ড ! সঙ্গে সঙ্গে ঘটল ঘটনাটি— একটা পিন কুশনেব মতো কিছু এসে সজোবে লাগল আনন্দেব ডান ভুরু চোখ এবং নাক ও ভুরুব সংযোগস্থলে। ক'টা পিনেব ডগা যেন বিঁধে গেল। নিষ্ঠুবভাবে বিঁধে গেল। মুহূর্তে ডান হাতখানা আপনা-আপনি উঠে বস্তুটাকে চেপে ধবলে এবং মুখ থেকে যন্ত্রণাকাতব এবং ক্ষুব্ধ চিৎকাব বেবিযে গেল অঃ। এবং টেনে ছাড়িযে নিল বস্তুটাকে। বিঁধে যেন আটকে গিযেছিল। নবম। উষ্ণ। হাতেব মুঠোব মধ্যে সে স্পন্দন অনুভব কবছে! হৃদ্‌স্পন্দনেব সঙ্গে কম্পন।—কি ?

কি ? একটা চড়ুই পাখি। আনন্দেব দৃষ্টি যখন ছত্রধাবিণীব ছত্রেব কালো কাপড থেকে মাটিব দিকে ওব চুল, ওব জবদা বঙেব ব্লাউজেব হাতা, কনুই, ধবধবে পাডহীন কাপডেব বেড বেযে স্যান্ডেল পবা পাদুযেব পাতাব দিকে বিচবণ কবছিল, তখন কাক শালিক চড়ুই প্রভৃতি পক্ষীবাজ্যেব নিযমানুযাযী তাদেব জীবনযাত্রা চলেছিল স্বাভাবিকভাবে। ইলেকট্রিক পোস্টে বসে থাকা একটা কাক একটা উডন্ত চড়ুইকে লক্ষ্য কবে ছোঁ মেবে নেমে এসেছিল,—চড়ুইটা প্রাণভযে উন্মাদেব মতো সম্মুখে ওই জানালাটাব দিকে উডছিল, কাবণ আব কোনও আশ্রয সামনে ছিল না। ওদিকে কাকটা ছো মেবে এসে ঝোক সামলাতে না পেবে ছত্রধাবিণীব ছত্রপ্রান্তে পাখাব ঝাপটা মেবে উপবে উঠে গিযেছিল —এদিকে চড়ুইটা উন্মাদ পলাযনেব বেগে এসে শিকেব ফাঁক দিযে ঘবে ঢুকে --আনন্দেব চোখেব উপব ও নাক ভ্রূব সন্ধিস্থলে ঝপ কবে পড়ে নখ দিযে আঁকডে ধবেছিল।

আনন্দ নিষ্ঠুবভাবে টিপে ধবলে চড়ুইটাকে। টিপেই মেবে ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে টপ টপ কবে দু' ফোটা বক্ত ঝবে এসে পডল তাব পাঞ্জাবিব উপব। ঘবেব ভিতবে দেওয়ালে টাঙানো আযনায তাব ছবি পড়েছে। চোখেব কোণ থেকে বক্ত গডিযে আসছে। মুখখানা রূঢ় কঠোব নির্মম হযে উঠেছে। দাঁতেব উপব দাঁত শক্ত হযে বসছে। হাতেব মুঠোও শক্ত হচ্ছে।

— ইস্‌, এ যে চোখ থেকে বক্ত পডছে আপনাব! মিষ্ট উদ্বিগ্ন নাবী কণ্ঠস্বব! ওই ছত্রধাবিণী কৃষ্ণাব। আনন্দ ফিবে তাকালে। হেসে বললে—হ্যাঁ। একটা চড়ুই।

হাতেব মুঠোটা খুলে দেখাল সে। তালুব উপব চড়ুইটা হতচেতন হয়ে পড়ে আছে।

পা দুটো মুড়ে বেঁকে গেছে। চোখ দুটো স্তিমিত। মধ্যে মধ্যে শুধু কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আবার আনন্দ মেয়েটির মুখের দিকে তাকালে। বেশ মুখ। লম্বা ধরনের মুখ। টিকলো নাক। চোখ দুটো আয়ত নয় কিন্তু টানা লম্বা। পাতলা ঠোঁট। মসৃণ মুখ। নিরীহ, শান্ত। সে তার কথাব পুনরুক্তি করে প্রশ্ন করলে—চড়ুই!

—হ্যাঁ চড়ুই। একটা কাক ছোঁ মেরেছিল— সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আপনার ছাতায়—

—হ্যাঁ। চমকে উঠেছিলাম আমি। ছাতাটা একপাশে বেঁকিয়ে দেখলাম কাকটা উড়ে যাচ্ছে—আর আপনি চোখে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছেন। তাবপরই দেখি রক্ত পড়ছে আপনার চোখ থেকে।

—চড়ুই প্রাণের ভয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে সামলাতে পারেনি—পাশ কাটাতে পারেনি বোধ হয় শিকগুলোব জন্যে। ঝপ করে এসে পড়েছে চোখের উপর।

সে আবার তাকালে—চড়ুইটার দিকে। এবার চোখ মেলেছে—তাকাচ্ছে। কালো চকচকে দুটি চোখ। দু' ফোঁটা টলটলে কালির ফোঁটার মতো। আশ্চর্যভাবে মনটা তার করুণার কোমলতায় ভবে উঠেছে। রূঢ়ভাবে সেটাকে টিপে ধবাব জন্য যেন মনে একটু লজ্জা হচ্ছে। বেদনাও অনুভব কবছে। আহা বেচারা প্রাণেব ভয়ে তপ্ত খোলা থেকে লাফিয়ে আগুনে পডাব মতো তার মুখেব উপর এসে পড়েছে মাথা ঠুকে। এবার নডছে।

মেয়েটি জানালাব ওপাশ থেকে বললে আপনি বক্তটা ধুয়ে ফেলুন। না—ববং ডাক্তাবকে দেখান। চোখেব ভিতবে কিছু—

— চোখেব ভিতবে?—সে আয়নাটাব দিকে তাকালে। ঠিক কোণ থেকেই বক্ত গড়াচ্ছে, কিন্তু চোখেব ভিতরে নয। শুধু জ্বালা কবছে, বিন্দু বিন্দু করে রক্তও জমে জমে গড়াচ্ছে- কিন্তু কোনও বেদনা নেই। কিন্তু—কিন্তু—। আয়নাব মধ্যে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখে অবাক হয়ে গেল সে। এই মিনিট খানেক আগে, বক্তের প্রথম ফোঁটাটা জামায় পড়তেই চড়ুইটাকে হাতেব মুঠোয় টিপে ধবে যখন কি হয়েছে দেখবার জন্য আয়নাব দিকে তাকিয়েছিল—তখনকাব ছবিটা তাব মনে পড়ে গেল। রূঢ় হিংস্র নিষ্ঠুর একজনকে দেখেছিল সে। তার বদলে এ কে? শান্ত কোমল প্রসন্ন একটি মানুষ।

বাইরে থেকে মেয়েটি প্রশ্ন কবলে—চো[illegible] ক্ষত হয়েছে?

একটু হেসে সে বললে—না। তাব মুখের দিকে সে আবার তাকালে। কালো লম্বা মেয়েটি—একটা শীর্ণা, লম্বাটে মুখ সরু কিন্তু টানা চোখ। ওই চোখের লম্বা টান এবং ওই একরাশ দীর্ঘ চুল ছাড়া শ্রী কোথাও নেই। তবু বেশ লাগল তাকে।

মেয়েটি বলেই যাচ্ছিল—তা হোক। চোখের ভিতর কিছু হয়নি—সে আপনার লাক্। কিন্তু পাখির নখ—বিষ থাকে শুনেছি। তাছাড়া পাখি তো ডালে পাতায় পথের ধুলোয় নোংরায় অহরহ ঘুরছে বসছে, বিষ লেগে নিশ্চয় থাকে। ওটা আপনি ধুয়ে ফেলুন। মানে আইডিন-টাইডিন দিয়ে। ডাক্তার দেখালেই ভাল কববেন।

আনন্দ বললে—ধন্যবাদ। হ্যাঁ তাই দেখাব।

বলে সে পাখিটার দিকে তাকালে। সেটা এখনও ধাক্কা সামলাতে পারেনি। উঠবার—পাখা ঝেড়ে উড়বার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

মরে যাবে নাকি ? ভারী কষ্ট লাগল। সে বললে—এটাকে একটু জল দি!

—আপনি আর্টিস্ট—না ? হেসে বললে মেয়েটি। তারপর বললে— ওটাকে বরং কোনও তাকে তুলে দিন—সামলে উঠবে। জল দেবেন—হয়তো নাকে ঠোঁটে বেশি জল পড়লে দম বন্ধ হবে নয় বুকে আটকাবে। অচ্ছা—নমস্কার।

চলে গেল সে। খাটো পাদক্ষেপে। লম্বা পা দু'খানি পর পর ফেলে সে ছাতাটিতে নিজের মুখখানা যথাসম্ভব ঢেকে চলে গেল।

হরিয়া চা নিয়ে এল। তাকে বললে টিংচার আইডিন আছে রে ? হরিয়া তার মুখের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বললে—কি হইল ?

—কিছু হইল। কেটে গেল। একটু জল আর টিংচার আইডিন আন তো। চায়ের কাপটা সে হাতে নিয়ে চুমুক দিয়ে বললে—বাঃ, বেড়ে চা করেছিস তো।

বাইরে আলো যেন লালচে হচ্ছে। আকাশের মেঘে সূর্যের পড়ন্ত আলোয় রক্তসন্ধ্যার ছটা ফুটছে। মেয়েটি বেশ! বাইরে মেঘের দল আসছে এদিক ওদিক দু'দিক থেকে। আনন্দ একমনে কিছু ভাবতে লাগল। রক্তসন্ধ্যার পটভূমিতে শালো দীর্ঘাঙ্গী সুদীর্ঘ এলোকেশী, লম্বা টানা সরু চোখ।

* * *

পরের দিন তখন বেশ একটু বেলা হয়েছে। আনন্দ উঠল। একটু যেন জর্জর যন্ত্রণা সারা মুখে। যন্ত্রণার কেন্দ্রবিন্দু চোখের কোণ, ভুরু ও নাকের সংযোগস্থল। হাত দিয়ে দেখল। ফুলেছে না কি ? একটু আয়নার দিকে তাকালে। হ্যাঁ, একটু ফুলেছে। রাত্রে বুঝতে পারেনি। রাত্রে খুব গাঢ় ঘুম ঘুমিয়েছে। টিংচার আইডিন লাগিয়ে কিছুক্ষণ জানালার ধারে সেই পূর্বের মতো দাঁড়িয়েছিল। মনটা খুব প্রসন্ন, তার থেকেও বেশি উল্লসিত, খুব খুশি হয়ে গেছে। বাইরের দিকে খুশি হয়ে তাকিয়েছিল কিন্তু কিছুই দেখেনি মানে ঠিক দেখেনি- কারুর দিকে মন আকৃষ্ট হয়নি। সেই প্রৌঢ়া পক্ককেশা বিলাসিনী গেলেন, কোলে নাতি হাতে পান— মনে সে কোনও কৌতুক অনুভব করেনি। একদল ছোট মেয়ে যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে, তারা এসে চলে গেছে। কি যেন বলেও ছিল সে বলেছিল হুঁ। কিসের উত্তরে হুঁ বলেছিল মনে নেই। রক্তসন্ধ্যা গাঢ় হয়েছিল, কাঁচ পাতার ঝিকিমিকিতে লাল আভা একটু মেরেছিল বোধ হয়, সেদিকেও ভাল করে তাকায়নি। ভাবছিল— বেড়ে রোমান্সটুকু হয়ে গেল। এরপর ? বিয়ে ? রাম কহো! ও পথে আনন্দ হাঁটেনি—হাঁটবে না। একটু খেলা ? তা মন্দ হয় না। মন অনেক দূর ছোটে। সে এ পাড়ায় থেকে হয় না। তবে ? অন্য পাড়ায় উঠে গিয়ে তবে হয়। যা দেশ!

সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ!

আনন্দের থিয়েটারের ঝোঁক আছে। সে অবশ্য সিরিও-কমিক পার্ট করে। সিরিয়াস পার্ট করতে পারে না। হাসি পায়। অবশ্য তার একারই নয়—এ যুগের সব তরুণেরই তাই। তরুণ-তরুণী—সব। তবুও চন্দ্রগুপ্ত নাটকের 'কি বিচিত্র এই দেশ' ভাল লেগেছিল ছেলেবেলায়। সেটা আজও লাগে। সোজা বাঁকা সব কথাতেই দেশের কথা উঠলে এই কোটেশন দেয় সে।

এ দেশের একটি মেয়ে একটি ছেলে পরস্পরের হাস্যে লাস্যে রসিকতায় সঙ্গ সাহচর্যে কয়েকদিনের জন্যে মিলবে খেলবে, আবার ছাড়াছাড়ি হবে ভুলবে—এ হবার উপায় নেই। কাল তবুও মন বাঁধ মানেনি। রোমান্সহীন দেশ, বিয়ের আগে বর-কনেতে আগে দেখা হত না। সাত পাকের সময়ে আজও পানে মুখ ঢেকে কনে শুভদৃষ্টি করতে আসে। বিংশ শতাব্দীর এটা ষাট বছর পার হলো, গোটা দেশে আজও ঘুঁটেতে উনোন ধরে। দামোদর প্রজেক্ট— ইলেকট্রিসিটির প্রসার করতে গিয়ে দেখা গেল, দামোদরের জল কমে গেছে। এ দেশে এখনও রোমান্স পত্রযোগে—বড়জোর আপিসে সহকর্মী-সহকর্মিণীর মধ্যে—তাও আপিসের পরে ধর্মতলায় কার্জন পার্কে কাগজ পেতে মাঠে বসে গোটা কয়েক আধো আধো কথার বিনিময়, একটু যাকে বলে—অনুচ্চ খাটো হাসিতে তাও সম্পূর্ণ হয়ে ফুলস্টপ পর্যন্ত এগোয় না, অন্য কেউ তাকালেই সেই তাকানোর কথা সেমিকোলনেই শেষ। সুতরাং আজকের এই চড়ুইয়ের নখে দু' ফোঁটা নাকের কোণের রক্তপাত দেখে একটি তরুণী মেয়ের অকৃত্রিম সহানুভূতিতে এগিয়ে আসা কি সোজা রোমান্স! আনন্দের মন আপনিই ছুটেছিল—স্বাভাবিকভাবেই। মনে মনে কাল বিকেলে ওকে নিয়ে ময়দানে বেড়িয়েছে, হাতে হাত রেখে পাশাপাশি বসেছে। রাত্রে—জেটীর উপর রেস্টুরেন্টে বসেছে।

মনটা তার অধীর চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এমন দিনে তার কাছে টাকা নেই! কখন আপনার অজ্ঞাতসারেই ডেকে ফেলেছিল—হরিয়া।

হরিয়া সাড়া দিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে,—যাই। এবং মিনিটখানেকের মধ্যেই এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল।—কি?

—ও! হ্যাঁ। মানে, তোর কাছে টাকাকড়ি আছে? কুড়িটে টাকা—

—অতো নাই। দশ টাকা আছে।

—দশ টাকা?—আচ্ছা তাই দে। না হলে যা বাজারে। বিলিতী মদের দোকান বের করে নিবি খুঁজে, বুঝলি? একটা রম হুইস্কী পাঁইট নিয়ে আসবি। বুঝলি? আর ভাল করে মাংস বানাবি।

হরিয়া চলে গিয়েছিল। সে এবার গতি পেয়েছিল দেহে মনে। সর্বাগ্রে দেখতে গিয়েছিল চড়ুইটাকে। কই? চড়ুইটা কোথায় গেল? কই, উড়ে তো জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায়নি। ঘরখানা অপরাহ্ণের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হচ্ছে ক্রমশ। এরই মধ্যে আবছা অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। জানালার সামনেটায় খানিকটা মেঝেতে খানিকটা আলো যেন এলিয়ে শুয়ে পড়েছে মাটির উপর। উপর দিকটা চারিপাশ

বেশ কালো দেখাচ্ছে। সে এগিয়ে গিয়ে সুইচটা টিপে আলো জ্বাললে। কোথায় গেলেন তিনি ?

সঙ্গে সঙ্গে—চ্রি-বি-ক—শব্দ করে চড়ুইটা উড়ল, ওই আলোটারই বাঁকা হোল্ডারটার উপর থেকে। ওই যে! তাক থেকে উড়ে গিয়ে কখন আলোটার উপর বসেছিল। আলোটা হঠাৎ জ্বলে উঠতেই চমকে উঠে উড়ছে। ভয় পেয়েছে। বেচারা!

সারা ঘরখানায় উড়ে পাক দিয়ে গিয়ে বসল একেবারে ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ইলেকট্রিক লাইনের বিটের উপর। কাঁপছে। নখ দিয়ে বিটের কাঠ আঁকড়ে ধরে দেওয়ালের কোণে যেন লেগে আছে। একটু সকরুণ হেসে আবার সে আলোটা নিভিয়ে দিয়েছিল। থাক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হরিয়া ফিরে এসেছিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বোতল খুলে খানিকটা খেয়ে সিগারেট ধরিয়ে খুশি হয়ে উঠেছিল। নেশা ধরতে দেরি হয়নি। হরিয়ার তুলনা হয় না। অদ্ভুত, স্পেলর্নডিড্, ওয়ান্ডারফুল। মুখরোচক খাদ্যগুলি তৈরি করে ডিসে পরিপাটি করে সাজিয়ে দিয়েছিল।

গান সে গাইতে পারে না। তবুও মৌজের মুখে— বেশ গলা ছেড়েই গান ধরেছিল

'কালো তা সে যতই কালো হোক—
দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।'

কিছুক্ষণ পর মনে পড়েছিল—কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাদো কেনে ? কালো কেশে রাঙা কুসুম । নাঃ—তারাশঙ্কর এখানে ফেল। হয়নি।

প্রমত্ত আনন্দের এলোমেলো চিন্তাগুলো চঞ্চল চড়ুই পাখির মতোই মনের গাছের মধ্যে লাফিয়ে এ ডাল ও ডাল করেই যেন ফিরছিল। বাইরে একটা বরফওয়ালা হাঁকছিল—ব্রোফ! তাকে ব্যঙ্গ না করেই সে তার নকল করেছিল—ব্রোফ! তারপরই সে নকল করেছিল চড়ুইয়ের ডাক—ক্রি বি চ! হয়তো বা দুটো শব্দের রফলায় একটার সঙ্গে অন্যটার কোথাও মিল পেয়েছিল।

হঠাৎ মনে প্রশ্ন হয়েছিল —চড়ুইটা কি ?

নারী অথবা— ? কি ? সে চেনে, চড়ুইয়ের কোন্‌টা পুরুষ কোন্‌টা মেয়ে। পুরুষ চড়ুইগুলো লালচে হয়, গলার নিচে একটা কালো রংয়ের ত্রিভুজ দাগ থাকে। বেশ ঘন কালো। মেয়েগুলো ধূসর হয়, মানে একটু ফর্সা, গলায় কালো দাগের হারের মতো একটা বেড থাকে। ডাকেরও পার্থক্য আছে। এটা কি ? নারী ? নিশ্চয়। না—ভাল করে দেখেনি তখন। আছে নাকি এখনও ? বেরিয়ে গেল কখন ? সে উঠে খুঁজতে শুরু করেছিল। কই ? কোণটা দেখেছিল সর্বাগ্রে। তারপর আলোর হোল্ডারটা। তারপর এদিক ওদিক। কই ? পায়নি দেখতে।

পালিয়ে গেল ?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল 'ওরে রাজহংস জন্মি দ্বিজবংশে এমন নিষ্ঠুর কেন হলি রে' ? —ভুল হলো নাকি ? হোক্। সে ছাব আকে লাইনে ভুল না হলেই হলো।

রাজহংসের ছবিতে—। থম্‌কে গিয়েছিল আনন্দ! ই-য়ে-স! হয়েছে! ইউরেকা! ইউরেকা!

—হ-রি-যা! হরিয়া।

হরিয়ার পেটেন্ট উত্তর—যাই। এবং মুহূর্তের মধ্যে এসে দাঁড়াল। —কি?

—রঙ তুলি দে! ছবি আঁকাব কাগজ—

—ছবি আঁকবে—এখন?

—এখুনিই।

ছবি আঁকবে সে। চড়ুই পাখি ও কালো মেয়ে। না—চটকদূত ও কৃষ্ণা। একটা জানালা—তার শিকে বসে আছে চটকদূত, বা পাখা মেলে এসে সদ্য বসছে। কালো— না কৃষ্ণা পথে থমকে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়েছে; একটা পা এইদিকে বাড়িয়ে দেবে। ইউরেক.!

হরিয়া বলে উঠল পিছনে রঙ তুলি কাগজ-রাখা দেওয়াল আলমারির কাছ থেকে--চড়ুই পাখীটা!

—চড়ুই পাখি?

- হঁ। সেই বিকেল বেলার পাখিটা হবে।

—কোথায়?

—এই যে, আলমারির তাকে রঙের বাস্‌কোটার উপর বসি রইছে।

—বসি রইছে?- -আনন্দ অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠে পড়ল। বললে-- ওড়াসনি। থাক।

—রঙের বাস্‌কোটার উপিরে বসি রইছে যে!

—থাক। রঙের বাকসো নাড়িস নে। থাক ছবি আঁকা। সরে আয় তুই!

হরিয়া সরে এল। আনন্দ এগুলো না বেশি, দূর থেকে দেখলে।--ধূসর রঙ, গলায় কালো একটি বেড শুধু কালো হারের মতো। ত্রিভুজ নয়।—দূতী! দূতী!

দূত হলে আজ ওটাকে ওই বোতলের পানীয়ের সঙ্গে রোস্ট করে খেয়ে নিত আনন্দ।

কিন্তু দূতী—সখী তুমি থাক। তুমি থাক

—হরিয়া।

—অঁ।

—পাঁউরুটি আছে?

—আছে।

—খানিকটা ভেঙে গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দে। সেই বিকেল বেলা থেকে ঘরে ঢুকেছে, বেরোয়নি তো, ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়। আর রঙের একটা ছোট বাটিতে জল দে একটু। এ্যাঁ?

হেসে হরিয়া বললে—রাত্তিরে উরা কানা হয়ে যায়। খাবে না।

—তুই দে তো! আলো থাকলে কানা হবে কেন? রাবিশ কোথাকার।

মুচকি হাসতে হাসতে হরিয়া চলে গেল। হরিয়া মনিবকে জানে। দিনেব মনিব রাত্রিকালের মনিব আলাদা। সে দু'জনকেই চেনে।

আনন্দ দূব থেকেই সস্নেহে মমতার দৃষ্টিতে চড়ুইটার দিকে তাকিয়ে রইল। ছোট্ট জীবটি। এতটুকু! ওঃ, ওই কৃষ্ণা যদি সেই শঙ্কিত সহানুভূতি মাখানো কণ্ঠে, তার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে—ইস্, আপনার চোখ থেকে রক্ত পড়ছে যে!—কথা ক'টি না বলত তাহলে মুঠোয টিপে ধরে মেবে ফেলত সে। মনে পড়ছে, মাটিতে সজোবে আছড়ে ফেলে দেবাব হিংস্র অভিপ্রায গর্তের মধ্য থেকে ক্রুদ্ধ সাপের বের হবাব মতো পাক দিযে উঠেছিল। হঠাৎ ওই কথা ক'টি এবং বলাব সুবটি, তার সঙ্গে নাবী কণ্ঠটি বাঁশের বাঁশীর মতো বেজে উঠে সাপটাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দিয়েছিল।

সে মৃদুস্ববে পাখিটাকে বলেছিল—Ask your God to bless her—not me She is—কালো? তা সে যতই কালো হোক —আমি দেখেছি তাব কালো-হরিণ চোখ!

হবিযা ফিবে এসেছিল পাঁউরুটিব গুঁড়ো এবং জল নিযে।

—দুধ তো আমাদেব নেই। চাযের জন্যে—সেও তো পাউডাব মিল্ক। তাই একটু কবে দে না। না। থাক। ওই থাক এখন।

—খাবে না। রাততিরি যে—! হাসলে হরিযা।

—তুই এত ফ্যাক্ ফ্যাক্ কবে হাসিস কেন বল্ তো?

হবিযা বলেছিল—খাবার হযে গেছে। বার্ত্তিবি ইগাবোটা বেজে গেল।

বোতলটাব দিকে তাকিযে দেখেছিল আনন্দ। সব শেষ হযে গেছে। বাত্রি এগাবোটা। সুতবাং সে বলেছিল—দে, তাই দে।

খেযে-দেযে বিছানায পড়বামাত্র ঘুমিযে পড়েছিল। শেষ বাত্রে তেষ্টা পেযে উঠে জল খেযে আবাব শুযেছিল। তখনই ক্ষতস্থানটা একটু টন টন কবছে বলে মনে হযেছিল। কিন্তু তখন ওটা হুইস্কীব প্রভাবে কিনা ঠাওব হয়নি। একটা সাবিডন খেযে শুযে পড়েছিল। তখন থেকে এখন বেলা সাড়ে আটটা পর্যন্ত নাগাড়ে ঘুমিযেছে।

সকালবেলা উঠে মনে হয়েছে ব্যথাব কথা। মুখ ধুতে গিযে হাত লেগে টন টন কবে উঠেছে। আযনায় দেখে দেখলে একটু ফুলেছে। বেশি না--সামান্যই। তবু ফুলেছে। কালো মেযেটিকে মনে পড়ল।

*　　　*　　　*

চড়ুই পাখিটাকেও মনে পড়ল। সে পিছনেব দিকে আলমাবিটাব দিকে ঘুবে তাকালে —নেই, পাখিটা উড়ে গেছে। আলমাবিটাব কাছে গিযে দাঁড়াল। এঃ, বঙের বাক্সটাব উপবটা মযলা করে দিযে গেছে। পাঁউরুটিব গুঁড়োগুলি তেমনিই ছড়ানো আছে। জলটা উল্টে পড়েছে।—যাক্, গেছে ভালই হযেছে। আবুহোসেনের বাদশাহীব মতো এইসব উদ্ভট কল্পনা রোমান্টিসিজম্ একরাত্রির স্বপ্নের মতোই হওয়া উচিত।

আবার মনে পড়ল কালো মেয়েটিকে। কোন্‌খানে ওর রূপ দেখেছিল—ভাবতে চেষ্টা করলে সে। রাবিশ্‌। কোথাও একফোঁটা রূপ নেই মেয়েটার। শুধু চুল। এবং সরু অথচ লম্বা টানা চোখ দুটিতে ফোঁটারও একটু, সিকি ফোঁটা শ্রী আছে।

সহমরণের দেশ—সতী বাতিকের হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে হয়, ঘোমটা বর্মাচ্ছাদিতা, অন্তঃপুর দুর্গবাসিনী নারীকুল যেখানে—সেখানে অনন্তকাল ধরেই স্বাধীন প্রেমের দুর্ভিক্ষ! সেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কঙ্কাল একজন; ডাস্টবিনের চারিপাশে ঘোরার মতো চৌরঙ্গীর বারে ও ধারে ঘোরে; কালকের সেই রঙ মাখা ব্রণওয়ালা ফিরিঙ্গী মেয়েটাকে দেখে চঞ্চল হয়, রোমান্স খোঁজে, এমনই যার আসল স্বরূপ—সে ওই কালো একটি মেয়েকে দেখে আদ্ধেক রাত্রি মদ খেয়ে নানান কল্পনা করবে তার আর আশ্চর্য কি। যাক সকালে নেশা কেটে আসল বাস্তববাদী মডার্ন মনুষ্যটি কবর ঠেলে উঠেছে এই সৌভাগ্য। গুড লাক্‌, আনন্দ, গুড লাক্‌!

ওঃ, কাজ কত!

ক'খানা বইয়েব কভার ডিজাইন। সুধীন মুখুজ্জের তাগাদায় কলেজ স্ট্রীট মুখো হবার জো নেই। উইলিয়ামস-এর ওষুধের প্যাকেট এবং খোলের ডিজাইনগুলো না দিয়ে কারু কাজ নয়। তার ভাতঘর।

—-হরিযা। হরি— হ-রি-যা—-

কোথায গেল? বাজার? তাহলে চা-টা নিজেই করে নিতে হয়। পারে সে সব। সব পারে। করেছেও তা। আজ পঁযত্রিশ বছব বয়সে সে বাসা কবেছে, হরিয়াকে রেখেছে। মাসে চাব-পাঁচশো সে রোজগাব করে, কিন্তু দু'বছর আগে পর্যন্তও এসব ভাবতে পারেনি সে। ভাগ্য ছাড়া একে কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না।

অনেক কাজ আছে। নিজেই চা করে খাবার জন্য রান্নাঘরে ঢুকল সে। চা খেয়ে বাথরুমে গেল। স্নান সেরে নেবে, মাথাটার মধ্যে নেশার প্রতিক্রিয়ায় কেমন একটা অস্বস্তি বয়েছে। মনের ভিতরটাও যেন অপরিচ্ছন্ন ঝাঁট না-দেওয়া না-মোছা ঘরের মতো হয়ে রযেছে। শুধু অপরিচ্ছন্নতাই নয। সারারাত্রি বদ্ধ ঘরের মতো একটা ভ্যাপসানি যেন মেজাজকে ভার কবে রেখেছে। স্নান করলেই পরিচ্ছন্ন হবে মন। জানালা খুলে দেওয়া ঘরের মতো আলোয় বাতাসে উজ্জ্বল এবং হাল্কা হয়ে উঠবে। কাজ ওই সাফা হাল্কা মন ছাড়া হয় না। নইলে মনের কাজে তার ছাপ পড়বেই। রঙ তুলি নিয়ে কাজ তার, সে তো জানে—তুলি ছেড়ে অন্য কাজে হাত দেবার আগে হাত ধুতে হবে। নইলে আঙুলে লাগা কালি কাপড় জামা থেকে মুখে পর্যন্ত লাগতে পারে। আবার তুলি ধরবার আগেও হাত ধুতে হবে। নইলে কোথায় কোন্‌ আঙুলের কোণে বা হাতের তালুর কোথাও লেগে থাকা দেওয়ালের রঙ বা মেঝের ময়লা নয়তো ঘামের ছোপ কাগজে ক্যানভাসে পড়বে, রঙের সঙ্গে মিশবে।

স্নানঘরে ঢুকে ঝাঁঝরি খুলে দিয়ে স্নান করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল এককালে সে স্নানের সময় মন্ত্র আওড়াতো—ওঁ সূর্য্যস্যমেতি মন্ত্রস্য প্রকৃতিচ্ছন্দ অপো দেবতা—। তারপরে ওসব ছেড়ে দিয়ে মন্ত্র পড়ার মতো ভঙ্গিতে আউড়ে যেতো—যে

করবে পুণ্যি তাকে শাপমন্যি—যে করবে পাপ তাকে আশীর্বাদ—বিনা আশীর্বাদেই সে সাত বেটাব বাপ। মনে পডতেই হাসি পেল।

ওঃ! জলের ধারা ঝরঝর কবে মাথায় গাযে ঝরে পডতেই মনটা হাল্কা হয়ে গেছে।

ঘর থকে বেরিযে এসে চুল আঁচডে কাজে বসল। মুহূর্তে আনন্দ পাল্টে গেল। এ আনন্দ আর এক আনন্দ। আনন্দ নিজেও তা জানে। একটা মানুষের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন মানুষকে দেখা যায়। একটা মানুষের মধ্যে দুটো তিনটে চারটে—এমন কি পঞ্চ-পাণ্ডবের বসবাস সম্ভব। ধার্মিক, সত্যবাদী, ঔদরিক, ক্রোধী, নারীবিলাসী, মিলিটারি এক্সপার্ট, অশ্ববিদ, একালে মোটরবিদ্ হতে পারে, জ্যোতিষবিদ—একটা মানুষই হতে পারে। আবার সেই বর্বর যুগ থেকে এ যুগ পর্যন্ত সব যুগেব মানুষই এই যুগের মানুষের মধ্যে থাকতে পারে। দুর্যোধনেরা একশো ভাই—কিন্তু আসলে ওরা একটি। ওদের ভাগ্যে দ্রৌপদী জুটতেই পারে না।

রাম্ কহো। ছোডো। ও সব চিন্তা ছাডো। উঠ শিশু মুখ ধোও পব নিজ বেশ, আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ। কাগজ নিযে বোর্ডে এঁটে সে রঙের পাত্র এবং তুলি তুলে নিলে।

হরিয়া এসে দাঁডাল।—জলখাবার দি।

—কি করেছিস ?

—ডিম ভেজেছি।

—তাব সঙ্গে রুটি দু' টুকরো। বাস্।

—মিষ্টি ?

—না। কাল যা খাইযেছিস!

—লোক এসিছে। বাইরে দাঁডায় আছে। একখানা কাগজ দিলে সে। আনন্দ পডলে।

জর্দাওলা বামেশ্বর। জর্দা বেচে বিখ্যাত হযেছে, পয়সা করেছে। এখন কৌটোয় প্যাকেটে রঙীন মোডক করবে। টাকা অগ্রীম দিযে গেছে। কাজটা হযনি। মনটা খিঁচডে উঠল। ভুরু কুঁচকে ফুটে উঠল সেই বিরক্তি। কিন্তু উপায় নেই—তিনমাস টাকা নিযে রেখেছে। মুহূর্ত ভেবে নিযে বললে—যা, বলগে আপনার কাজই করছে। কাল এসে নিয়ে যাবেন। এখন দেখা করতে গেলে সময় যাবে। আপনার কাজই নষ্ট হবে।

হরিয়া চলে গেল। আনন্দ বললে—রাবিশ! চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। হয়েছে। একটি পদ্ম—তার মধ্যে জর্দার কৌটো। একটি মেয়ে, তার একহাতে পান অন্য হাতটি—ডানহাতটি বাডিযেছে জর্দা নেবার জন্যে। নিচে লেখা হবে—ও হরি! রামেশ্বরের জর্দা! আমি ভেবেছি পদ্ম! ওই যে বিলাসিনী স্থূলকায়া পক্ককেশী সুরূপা সুহাসিনী গরবিনী ধনি পার্কে আসেন নিত্য—ওকেই এঁকে দেবে।

খুশি হয়ে নিজেই বললে—গুড। ভেরি গুড!

কাগজের উপর পেন্সিল চালিয়ে স্কেচ শুরু করলে এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে মগ্ন হয়ে গেল। এ বেলাতেই সারতে হবে এটাকে। এ বেলাতেই! ওবেলা থেকে উইলিয়মস কোম্পানির কাজ!

সে আনন্দ পাববে। পাবে সে। তার সে হিম্মৎ আছে।

ওঃ এক সময়—একদিনে পাঁচটা স্কেচ শেষ করে কাগজে জোগান দিয়েছে। ১৯৪৩।৪৪ সালে দুর্ভিক্ষ মন্বন্তরের সময়।

আজও সে শক্তি তার আছে। পেন্সিল তর তর হাল্কাটানে চলেছে।

প্রৌঢ়ার মুখখানা একটু ভেবে নিলে। হ্যাঁ। গালে একটা কি দুটো পান পোরা আছে। একদিকের গাল আবের মতো ফুলেছে। কিন্তু তবুও সৌন্দর্যহানি হয়নি।

ঠিক আসছে। আজও সে শক্তি তার আছে।

তবে সে দিনের সে ক্ষোভ সে জ্বালা আজ তেমনটি নেই। আছে কিন্তু উগ্রতার উত্তাপে ঠিক তাই নয়। ফারাব। সেদিন ছিল শুধু আগুন। আজ আগুন জল একসঙ্গে। স্টীম হচ্ছে -এঞ্জিন চলছে। সেদিন ছিল ঘরের মাথায় মাথায় বৈশাখের দুপুরের ছুটন্ত অগ্নিবর্ণ ধুলো ঘোড়ার পাল। লাগাম বাঁধা নয়। বন্য উন্মত্ত খুরে খুরে মাঠ ক্ষেতের ধুলো ওড়া ঝড়ের মতো। মন্বন্তর নেই আর। দুর্ভিক্ষ নেই। অভাব আছে। ত্রিবিশ টাকা চালের মণ, চার পাঁচ টাকা মাছ—তা হোক, অভাবই বলতে হবে, দুর্ভিক্ষ নয়। ইংরেজ চলে গেছে। দেশ স্বাধীন। তার রোজগার আজ তিন চারশো। সেদিন তার ত্রিবিশ টাকা কেন তের টাকাও আয় ছিল না।

উনিশ বছর বয়স। আশ্রয়হীন। মামার বাড়িতে ছেলেবেলা বড় হয়েছিল। আরও ছেলেবেলা পাঁচ বছর বয়সে বাপ মারা গিয়েছিল। নিতান্তই কেরানী চাকরে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের হাজার আড়াই টাকা নিয়ে মা এসেছিল মামাদের আশ্রয়ে। মা মামাদের ভাত রান্না করত, ভগবানকে ডাকত, স্বামী অর্থাৎ তার বাপকে গাল দিত, সঙ্গে সঙ্গে তাকে এবং তার ছোটকে। বড় ভাই ভাল ছেলে, বি. এ. পাশ করে খড়্গপুরে রেলে ঢুকেছে। সে দাদার থেকে তিন বছরের ছোট, ম্যাট্রিক বার দুই ফেল করে ইস্কুল ছেড়ে প্রাইভেট দেবে বলে ঘরে বসে আছে। ঠিক বসে আছে নয়, এই ছবি দেখে ছবি কপি করছে। শ্লেটে করত। কাগজেও করত। একদিন মামার বাড়িতে একটা কাণ্ড ঘটেছিল। বাড়ির ড্রেন পায়খানা নিয়মিত সাফ করে না বলে উগ্রচণ্ডী মামী কানীয়া জমাদারনীকে শাসন করতে গিয়েছিল। মাথায় খাটো মুখখানা খাপচো তাতে বসন্তের দাগ, মাথার চুলগুলো কাফ্রি ধরনের কানীয়ার। মামী উগ্রচণ্ডা হলে প্রচণ্ডা চামুণ্ডা। মামী বকাবকিতে হেরে একখানা ঘুঁটে ছুঁড়ে কানীয়াকে মেরেছিল; মুহূর্তে ক্ষিপ্তা কানীয়া তার মুড়ো ঝাটা নিয়ে তাকে তেড়েছিল। মামী রান্নাঘরে ঢুকেছিল নিরাপদ স্থান ভেবে, কিন্তু কানীয়া তা মানেনি। সে ঝাঁটা উদ্যত করে ঘরে ঢুকতে পা বাড়িয়েছিল, তখন উপায়ান্তর না দেখে মামী তুলেছিল আঁশবঁটি। তারপর কাণ্ড

অনেক দূর এগিয়েছিল, প্রায় এদিকে কোর্টের বার লাইব্রেরি ওদিকে মিউনিসিপালিটির কমিশনার মিটিং পর্যন্ত।

মামী মামাতো ভাইদের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল না। মায়ের সঙ্গে ভাবটা যে কি—তা সে আজও ঠিক অনুমান করতে পারে না। তবে মা তার উপর সন্তুষ্ট ছিল না, গালাগাল মাও কম করত না।

দু' দু'বার ফেল করবার পর মামা-মামী বারবার বলত —আবার পড়া কেন? বেশ তো প্রাইভেট দিবি তো সে তো চাকরি নিয়েও দিতে পারবি। মিথ্যে ঘরে বসে অন্নধ্বংস কেন? আর তোকে ভাত দিতে পারব না।

সে বলত,—আমার মা তোমাদের ঘরে বিনা মাইনেতে ভাত রাঁধে। কাপড় পর্যন্ত দাও না। মা কেনে পরে বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা থেকে। আমার অন্ন মায়ের মাইনে থেকে হয়।

মা বলত—তুই মর মর মর!

—মরব। তার আগে বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার ভাগ আমাকে মিটিয়ে দাও। ভাইকে বল, ধার বলে যা নিয়েছে ফেলে দিতে। ধার —ভাত! টাকার সুদ দেয় তোমার ভাই!

সে যে এমনটা কেন হয়েছিল বলতে পারে না। তবে হয়েছিল। এরই মধ্যে সে এই মামী রানীয়া কাণ্ডটা নিয়ে একটা ছবি—ছবি অবশ্য সাদা কাগজের উপর কালিতে এবং পেন্সিলে- এঁকে দিয়েছিল ওখানকার হাতে লেখা পত্রিকায়। নাম দিয়েছিল—উগ্রচণ্ডা ও চামুণ্ডা। একদিকে সারিবদ্ধ উকীল মোক্তার ভদ্রলোক, অন্যদিকে সারিবদ্ধ জমাদারেরা।

ছবিটার তারিফ হয়েছিল। ওখানকার নেতা (বামপন্থী) তাকে ডেকে বলেছিলেন—ভাল হয়েছে। ওটা আমি কলকাতার কাগজে ছেপে দেব।

বিপদ হলো ওইখানে।

ছাপা হতেই নজরে পড়ল লোকের। তাতেও কিছু হত না, কিন্তু মামী এবং রানীয়াকে স্পষ্ট চেনা গিয়েছিল।

ফল বিপর্যয়।

মা মাথা ঠুকে কপাল ফাটিয়েছিল। মামা মামাতো দু'ভাই তার সঙ্গে তার নিজের দাদা, গুডফ্রাইডের ছুটিতে দাদাও বাড়ি এসেছিল, সব মিলে চারজনে তাকে ধরে প্রহার করেছিল। সে মার খেয়ে নীরবেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। সেই এসেছে। বাস্। আর ফেরেনি। ফিরবেও না কোনদিন।

কলকাতায় তাকে প্রথমটা সাহায্য করেছিলেন সেই বামপন্থী নেতাটি। বেশিদিন সাহায্য করতে হয়নি, মাস কয়েক। সে তখন কলকাতায় ঘুরে ঘুরে দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকত। সাদায় কালোয় ছবি।

জয়নাল সাহেব তখন ওই ছবির জন্য বিখ্যাত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে তার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছুলো। সাদা কালো ছেড়ে রঙ ধরলে। মেসে থাকত। মেস

থেকে বোর্ডিং—একলা একটা রুমে। তারপর নিজের একখানা ঘর। নিজে রান্না। তারপর এসেছে হরিয়া।

সে তখন ছিল ফায়ার। এখন জ্বলে আগুনে স্টীম।

—খেলেন নাই!

হরিয়ার কণ্ঠস্বরে তার ধ্যান ভাঙল।—কি ?

—খাবার।

—কখন দিলি ? বলে দিতে হয় তো!

—বললাম যি ?

—বলেছিলি কি ? তা হলে শুনতে পাইনি আমি। দুধটা একটু গরম করে আন।

কাজ করতে বসে এমনই ডুবে যায় আনন্দ। কিছুক্ষণ কাজ করে সেটাকে সে সরিয়ে রেখে দিলে। টাকা চাই। কিছু স্কেচ নিয়ে উইলিয়মসে যেতে হবে, দেখিয়ে টাকা আনতে হবে। না। আবার সেটাকেই টেনে নিলে। ওটাকেই শেষ করে দেবে সে আজ। একখানা চেক্ নিয়ে হরিয়াকে দেবে—ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনুক। কাজে অসৎ হলে চলবে না। যেখানে খুশি মিথ্যে বলো, কাজের ক্ষেত্রে মিথ্যে কথা বলো না। অন্তত—খুব বড়োর কাছে বলো না—আর একদম ছোটোর কাছে বলো না। মাঝারিদের কাছে বলতে পারো, দরকার হলে বলো। আবার তুলি চালাতে লাগল। টানে টানে বিলাসিনী প্রৌঢা স্থূলাঙ্গী ফুটে উঠেছে। হঠাৎ ক্রি-রিচ-ক্রি ক্রি, ক্রিরির ক্রিরির-ক্রিচ-ক্রিচ-ক্রিচ শব্দের সঙ্গে পাখার ফরর্ ফরর্ শব্দে সে চমকে উঠল। হ্যাঁ চমকেই উঠল। চড়ুইটা ঘরে এসে ঢুকেছে। মুখ তুলে সে দেখলে। হ্যাঁ—সেইটে এসেছে। সেইটেই। মাদী চড়ই। ধূসর রঙ, গলায় সরু একটা কালো বেড হারের মতো।

—তুমি আবাব এসেছ? কি সংবাদ ? আজ কে তাড়া দিলে ?

—কেউ না ?—না ?—ওই যে একদল। একটা লালচে চড়ুই গলায় কালো ত্রিভুজ—এসে জানালাব শিকে বসেছে। ওই নরাধম তোমার পশ্চাদ্ধাবন করেছে! এবং তুমি ওকে পছন্দ কব না। অথবা এটা তোমাব প্রণয়লীলার একটি অঙ্গ। আমাকে তুমি নারীরক্ষক বীর ভেবেছ! তোমার এ প্রকার বিশ্বাসের জন্য ধন্যবাদ!—যাও, তুমি যাও হে!

আনন্দ ডান হাতের তুলিটা উস্কে নারীলোলুপ পুরুষ চড়ুইটাকে তাড়া দিলে। তাতে সেটাই শুধু উড়ে গেল না, এটাও ত্রস্ত হয়ে ঘরময় দু'পাক উড়ে—ফুড়ুৎ করে জানালা দিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল। আবার সে কাজে মন দিলে। তুলি নিয়ে বসল। চলতে লাগল তুলি। কিন্তু মন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তুলি রেখে সে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল। এগারটা বেজে গেছে। রোদ আজ চড়া মনে হচ্ছে। গরম হাওয়া আসছে। বাইরে, পার্কের ওদিকটার বড় ওয়ানওয়ে রোডে লরী বাস প্রাইভেট চলছে। ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে। একবার একঝাঁক, তারপর একটু বিরতি, আবার একঝাঁক। দেখ—দেখ—দেখ—। একটা বাস আর একটাকে ওভারটেক্ করছে। লাগল বোধ

হয়। না—বেরিয়ে গেল। প্রথম বাসখানাই—ডাইনে চেপে—পিছনেরটার পথ মেরে জোরে বেরিয়ে গেল।

একখানা বাস থেকে হরিয়া নামল। ব্যাঙ্ক থেকে ফিরছে।

হরিয়া তার জীবনের একটা সম্পদ। এই তো ঘণ্টাখানেক আগে গেছে।

আঃ! আবার তার কানের পাশ দিয়ে চড়ুইটা ঘরে ঢুকল। মরেছে—এটা কি ভেবেছে! পাখিতেও কি ভাবে না কি? ভাবে বইকি! নইলে তাকে গ্রাহ্য না করেই ঘরে ঢুকল কি হিসেবে?—অবশ্য হতে পারে, ওরা মানুষদেরই গ্রাহ্য করে না, বা মানুষকে জানে এই বলে যে—ওরা গ্রাহ্য করবার মতো জন্তুই নয়। শুধু ঘরটাকে ওর চেনা হয়েছে এবং নিরাপদ স্থান বা মনোরম স্থান বলে ধারণা হয়েছে।

হায় হায় হায়! তুমি জানো না, কার ঘরে তুমি ঢুকেছ—এইবার জানালা ক'টি বন্ধ করে, তোমাকে তাড়া দিয়ে এখুনি ধরে ফেলে মেরে ফেলতে পারি। মরা তুমিকে ছুঁড়ে কোন কাককে দিয়ে দিতে পারি, অথবা তোমাকে ভেজে খেয়েও ফেলতে পারি। অবশ্য—তাহলে হরিয়াকে এখুনি পাঠাতে হবে মদের দোকানে। কিন্তু তার সময় এ নয়।

চড়ুইটা উড়ছে। ওই ঘরের কোণে বসল। আবার উড়ল। হোল্ডারে বসল—আবার উড়ল। এবারও কোণে বসল। আবার উড়ল—কালকের আলমারিতে বসল।

চ্রিরিক—চ্রিরিক। চ্রিক—চ্রিক—চ্রিক—!

সঙ্গে সঙ্গে লেজটা নাচছে। গলার কাছটায় কাঁপছে। মাথাটা চঞ্চল ভঙ্গিতে নড়ছে। এপাশ-ওপাশ—কখনও উপরের দিকে তাকাচ্ছে। কখনও নীচের দিকে। মধ্যে মধ্যে ঠোঁট ঘষছে। লাফাচ্ছে নাচার মতো।

সামনের দেওয়ালে ব্র্যাকেটে একটা পুরনো ক্লক ঘড়িতে ঢং শব্দ করে সাড়ে এগারটা বাজলে সে ফিরে এসে কাজে বসল। বসেই সে শুনলে—ক্রিরিচ—এবং ফ্রর-র্। পাখিটা পালাল। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে—ওই পাখার আওয়াজে বোঝা যায়। ঘরের মধ্যে পাখার ফ্রর শব্দ—বাইরে গেলেই হাল্কা হয়ে পড়ে। সিনেমার ফেড আউট।

সিনেমার পাবলিসিটি অফিসার বন্ধুটি এক নম্বরের চালিয়াৎ। সেদিন সিনেমা ড্যান্সার বলে একটা সস্তা বারে নিয়ে যা দেখালে!

তার থেকে বউবাজারবাসিনী ব্রণশোভিতাবদনী ফিরিঙ্গিনী মেম-সাহেব লিপস্টিক রুজে এবং সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ানোর কায়দায় ন্যুইয়র্কবাসিনী।

রাবিশ! হঠাও ও সব চিন্তা। হট্ যাও। রামেশ্বরের জর্দার পালায় পর্দা নিক্ষেপ আজ করতেই হবে। তুলি চলতে লাগল। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল। সে কাজ করেই চলেছে। ঢং—সাড়ে বারোটা। ঢং—একটা। ঢং—দেড়টা।

হরিয়া এসে দাঁড়াল—খাবার দিব?

—এ্যাঁ।

—দেড়টা বাজি গেল।

—বাজুক।

আবার ঢং ঢং। দুটো। হরিয়া এসে দাঁড়াল। মনিবের একাগ্র মনে তুলি চালানো দেখে ফিরে গেল। আরও কিছুক্ষণ পর আনন্দ কাজ শেষ করে উঠল। রামেশ্বরের জর্দা খতম।—হরিয়া! খাবার! ঘড়ির দিকে তাকাল—দুটো পনেরো। গরম হাওয়া বইছে। এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। ওঃ। নিজেই সে জানালার পাল্লা টেনে দিতে লাগল।

ক্রিচ—ক্রিচ—ক্রিচ—ক্রিচ!

তার সঙ্গে ফ্রর্‌র্‌ ফ্রর্‌র্‌ শব্দে ঘরখানাকে মুখরিত করে চড়ুই উড়ছে। সেই চড়ুইটা। ধূসর রঙ, গলায় হারের মতো কালো বেড—ত্রিভুজওয়ালাদের থেকে আকার একটু বড় কিন্তু দেখতে সুন্দর। সেই নারীটি। কখন এসে আবার ঘরে ঢুকেছে। বাইরের রৌদ্রে উত্তাপ এখন, সব পাখি এমন কি কাকগুলোও গাছের পল্লবের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। নিস্তব্ধ হয়ে আছে। ধুঁকছে। সবারই গলার কাছটায় ধুক্‌ ধুক্‌ করছে। ইনি—কালকের পরিচয়ে ঘরখানিকে জেনে এর মধ্যে এসে বসেছিলেন। বাইরে থেকে ঘর অনেক ঠাণ্ডা।

উড়ছে। ও ভাবছে—জানালা বন্ধ করছে যখন তখন ওকে ধরবে। অথবা অন্ধকারের ভয়।

খানিকটা ভয় দেখালে কি হয়? ভয় কেন? যাক। বন্ধই থাক না ঘরে। শ্রীমতী যখন আনন্দ রায়ের ঘরে ঢুকেছে, তখন কলঙ্ক না নিয়েই ফিরে যাবে? থাক। বিকেলে উঠে আনন্দ জানালা খুলে দেবে তখন বেরিয়ে যাবে। বাইরটা তখন ঠাণ্ডা হয়ে আসবে। পুরুষ চড়ুইয়েরা কল কল করবে। কলঙ্কিনী বলবে। সে বন্ধ করে দিলে জানালাটা। অন্ধকারের মধ্যে খানিকটা ফর ফর করে উড়ে অসহায় বন্দিনীর মতো কোনো কোণে আশ্রয় নিলে। আনন্দ শুয়ে পড়ে বিছানার পাশে রাখা টেবিল ফ্যানটার সুইচ অন্‌ করে দিলে। ঘরে সিলিং ফ্যান রাখেনি আনন্দ। টেবিল ফ্যান রেখেছে। খুব গরমের সময় ভিতর দিকে বারান্দায় শুয়ে টেবিল ফ্যানটা খুলে দিতে পারে। ফ্যানটা ওঁ-ওঁ শব্দ করে ঘুরতে লাগল—আঃ।

চড়ুইটা এখন খুব মৃদু একটা শব্দ করছে—চিনিক্‌ চিনিক্‌। চিনিক্‌ চিনিক্‌।

ওটা বোধ হয় ক্লান্তি বা অসহায় অবস্থার শব্দ। বেরুবার উপায় নেই। হেসে আনন্দ বললে—ছেড়ে দিতে পারি তোমাকে, যদি সেই কালো মেয়ে, যার দূতী হয়ে এসেছিলে, সে যদি আসে। বুঝেছ? সে চারটের সময় যাবে তখন জানালা খুলে দেব, তুমি গিয়ে তাকে ডাকবে। একটু হাসল সে। তারপরই ঘুমিয়ে পড়ল। ভাবতে ভাবতেই ঘুমোল—সকাল সকাল উঠতে হবে। কিছুকাল কলেজ স্ট্রীট যায়নি। ওখানটা ঘুরে মিশন রো। উইলিয়মসকে বলে আসবে দু'-তিন দিনের মধ্যেই আদ্ধেক কাজ সে দেবে।

বউবাজার থানার সামনেটা মনে ফুটে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

ব্রণমুখী, খাটো ফ্রক পরা, সিগারেটের ধোঁয়া আকাশে নিক্ষেপকারিণী কার দিকে

সিগারেটের ধোঁয়া ছোড়ে? সে খুশি হবে যদি সে ঈশ্বরের দিকে ছোড়ে। ওরই মধ্যেই তো নীতির গুদাম। সিগারেটের ধোঁয়ায় প্রলুব্ধ হয়ে নীতি মরালিটি—সিগারেট খেতে শিখুক না।

ঘুম কিন্তু ভাঙল দেরিতে। পাঁচটার কাছাকাছি। ঘুম ভেঙেই প্রায় ধড়মড় করে উঠে বসল। ক'টা বাজল। ঘড়ির সাদা ডায়েলটা দিনের বেলা দরজা-জানালা বন্ধ সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে। পাঁচটা বাজতে দু' তিন মিনিট। এঃ! ছত্রধারিণী মুক্তকেশী দীর্ঘাঙ্গী কৃষ্ণা চলে গেছে। বউবাজারের থানার সামনে দিয়ে ব্রণমুখীও সিগারেটের ধোঁয়া আকাশে ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলে গেছে। কলেজ স্ট্রীটে যেতে যেতে দোকানে দোকানে ক্যাশ মেলাবার পালা পড়বে। উইলিয়মসের জু সাহেব হয়তো বেরিয়ে যাচ্ছে। না গেলেও সে যাবামাত্র বলবে—সরি রয়! আমি উঠছি। দেরিতে এসেছ। কাল ফার্স্ট আওয়ারে এস। স্কেচ দেখব। বাই-বাই!

টং টং শব্দ উঠতে লাগল, পাঁচটা বাজছে।

সিগারেট বের করে মুখে পুরলে সে, দেশলাইয়ের কাঠি বের করলে। হঠাৎ চ্রিরিক, চঞ্চল চ্রিক-চ্রিক-চ্রিকের সঙ্গে পাখার শব্দ উঠল। চতুর চড়ুই তো। ঠিক বুঝেছে, উঠে বসেছে! বলছে, কথা রাখ, জানালা খোলো, যেতে দাও এবার। যা করলে—

আরে। আরে! তাতো না। উড়ে গিয়ে ঘড়িটার মাথায় বসেছে। টং—টং—টং—টং শব্দে বেজে চলেছে আর চড়ুইটা ঠোঁট দিয়ে ঘড়িটায় ঠোক্কর মারছে।

সবিস্ময় কৌতুকে আনন্দ সেই দিকে তাকিয়েই রইল—বা রে!

ঘড়িটার বাজনা থামল—পাঁচটা ঘণ্টা ফুরিয়ে গেল। চড়ুই আরও বার কয়েক ওটাতে ঠোক্কর মেরে থামল, ঘাড় কাত করে কয়েক সেকেন্ড, অন্তত বিশ সেকেন্ড তাকিয়ে দেখল, তারপর আবার ফ্ররর্ শব্দে পাখা মেলে জানালার গায়ের শিকে বসল। বাইরের পড়ন্ত বেলা ওকে ডাকছে! প্রাণ ওর ছটফট করছে।

ক্রিরিচ্—ক্রি-রিচ—ক্রিচ—ক্রিচ—ক্রিরিচ—

তারপর থেকে মৃদু কিরিচ—কিরিচ।

আহা হা। সিগারেট না ধরিয়েই আনন্দ উঠল। জানালাটার কাছে যেতেই পাখিটা উড়ে গিয়ে বসল আলোর হোল্ডারে। আনন্দ জানালার এক পাট খুলতেই একটি সুউচ্চ সুদীর্ঘ ক্রি-রি-রি-চ ডেকে—একটি সোজা রেখা টেনে মুহূর্তে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আঃ, বেচারা বাঁচল। একটু হেসে আনন্দ সিগারেট ধরিয়ে ডাকলে—হরিয়া।

—যাই। হরিয়া 'যাইটি' বলে ভারী চমৎকার। একটি সুর আছে। তার সঙ্গে সস্নেহ আনুগত্য।

—আসতে হবে না—চা নিয়ে আয়।

জানালার বাকি পাল্লাগুলি এবার খুলে দিলে আনন্দ।

পড়ন্ত বেলায় দেবদারুর কচি পাতায় আলো চিকচিক করছে। আজ একটা হাওয়া এর মধ্যেই উঠেছে—কলকাতার সুবিখ্যাত সমুদ্রস্পর্শবহ বাতাস। গ্রীষ্মের আরাম।

আজ প্রথম উঠেছে। তবে তো আজ ময়দানে যেতেই হবে। আকাশ পরিষ্কার। হরিয়া—চা আন, জলদি।

শিমূল ফুল জাতীয় লাল ফুলগুলো আলোতে চকচক করছে। একটা ফুল খসল। ফুটবল নিয়ে একটু কি একফালি খোলা জায়গার সন্ধানে বাচ্চা ছেলের দল চলেছে। পার্কে ওদের খেলতে দেয় না। ওপাশে জিমখানার মাঠে বড়দের খেলার আসর। তারা—ওই যে একদল যাচ্ছেন—সিগারেট ফুঁকছে, হেসে ঢলে পড়ছে, এ ওকে ঠেলছে এবং পার্কের ওদিকটায় মেয়েদের দেখে এসে তাই নিয়ে গ্যাঁজানো রসিকতার স্বাদে মুখ পাকলাচ্ছে। এযুগে এটা—এ যুগেই বা কেন—সব যুগেই আদিকাল থেকে আদিরস আছেই। তারা নিজেরাও করে। সেও করে। ঘরে বসে ভাবনার মধ্যেও করে। পাখি সবাই—এগুলো নেহাতই কউয়া। কাক। ওই একদল মেয়ে আসছে। স্কুলের ডবল বেণী; যুবতী হয়েছে, সেই স্বপ্নের ঘোর লেগেছে। সবে শাড়ি ধরেছে। দুটো মেয়ের এলো চুল। ছোট্ট বাচ্চা একটা ওদের পিছনে ট্রাইসিকিল চড়ে আসছে, সঙ্গে মা – মা একটা প্যারাম্বুলেটর ঠেলছে। এরর ছেঁড়ারা ফেনিয়ে বোধহয় উপচে পড়বে। এরার একজনকে একজন ঠেলা দেবে। প্রাণপণ জোরে ঠেলা মারবে, হয়তো সে পড়তে পড়তে সামলাবে এবং হঠাৎ খুব রেগে গিয়ে উচ্চ রীর চিৎকারে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করবে। ভগবান আশ্রিত এদেশের নীতিজ্ঞান সিগারেট ধরলে বাঁচতো, খায় না বলে ঘরের কোণে লুকিয়ে গাজা খায়। তার ফলে এই অবস্থা।

পাশের একটা গলিপথ থেকে ছাতা মাথায় দিয়ে লাঠি হাতে থপ্‌থপে বৃদ্ধটি বেরিয়েছে। ধপধপে সাদা রং- চুল ভুরু সব সাদা। ভুরুগুলো খুব বড়। বিচিত্র দেখায়। থপথপ করে হাটে। যখন বের হয় তখন ছাতা লাঠি ছাড়া বের হয় না। ওকে দেখে আনন্দ বুঝতে পারে জরা দেখে গৌতম বুদ্ধ এত বিচলিত হয়েছিল কেন? বৃদ্ধের শবযাত্রা তাকে যেন দেখতে না হয়। তাহলে কে বলতে পারে গৌতমের তৃতীয় পাদে সে পা রাখছে না। বাকি থাকবে ..্যাসী —। এদেশে ভাল সন্ন্যাসীরও অভাব নেই। তাহলেই সেও নির্বাণকামী হয়ে বেরিয়ে পড়বে।

—চা এনেছি।

হরিয়া পিছনে দাঁড়িয়ে ডাকছে। ফিরে দাড়াল সে। টিপয়ের উপর ডাইজেস্টিভ বিস্কুট আর চা নামিয়ে দিয়ে হরিয়া দাড়িয়ে আছে। হরিবতে হরিয়া যাকে বলে অপরাজেয়। এমন পরিচ্ছন্ন এবং আধুনি' ',' দুরস্ত হরিয়া যে এইটুকু প্রশংসা ওর সম্পর্কে কিছুই নয়।

বিছানায় এসে বসল আনন্দ, বললে—যার হরিয়া নেই তার কেউ নেই।

খুশিতে হরিয়ার এক ধরনের দাত বের করে নিঃশব্দ হাসি আছে। হাসলে হরিয়ার গালের খাজ দুটো চমৎকার হয়। মধ্যে মধ্যে ভাবে আনন্দ।

একটা মেয়েছেলে এসেছিল।

— মেয়েছেলে?

— হ, কালো মেয়ে একটা-- রোজ ছাতা মাথায় দিয়ে যায়

—ও। এঃ—

একঝলক চা পড়ে গেছে আনন্দের কাপ থেকে। হরিয়া ব্যস্ত হয়ে উঠল পড়ে-যাওয়া চা মুছতে নিজের গামছাটা নিয়ে। আনন্দ বললে—থাক না।

—না, দাগ ধরে যাবে।

—কি বলছিল সে ?

—শুধোচ্ছিল, বাবু কেমন আছে। চোখের কোণটা পাখির নখে কাটিল—তা মুখ টুক ফুলিছে কিনা। জ্বর টর হয়েছে কিনা।

—তুই কি বললি ?

বললাম, না কিছুই হয় নাই।

— তা কেন বললি ? এই তো একটু ফুলে রয়েছে ?

অপ্রতিভ হয়ে গেল হরিয়া, মাথা চুলকে একটু হেসে বললে—সকালে তো বললে না। ডাক্তার দেখালে না। ওষুধ লাগালে না । তাই— । দাত ক'টা বের করে হাসির একটা ভঙ্গি করে সে চুপ করলে।

এর উত্তর আনন্দও খুজে পেলে না। একটু চুপ করে থেকে বললে—আমায় ডাকালনে কেন ?

— ঘুমাচ্ছিলে। সকাল থেকে দুটো পর্যন্ত কাজ করিছ। খুব ঘুমাচ্ছিলে, নাক ডাকছিল। আর মেয়েটা বললে— ডাকতে হবে নাই। দরকার কিছু নাই। কেমন আছেন তাই শুধাচ্ছি। ভাল আছেন, ঘুমাচ্ছেন, কাজ করেছেন সকাল থেকে —ঠিক আছে।

চুপ করে বসে রইল আনন্দ। একটু দাঁড়িয়ে থেকে হরিয়া চলে গেল। চড়ইটা আবার কখন এসে ঘরময় একটা পাক মেরে ডাকল চিরিক ! চিরিক ! চিরিক ! চিরিক ! বিরক্ত হয়ে আনন্দ বললে জ্বালালে তো এটা ! ভাগ ! ভাগ !

হরিয়া ফিরে এসে দাঁড়াল। তার কাজ আছে, আনন্দ বাইরে বের হবে, প্যান্ট জামা বের করে দিতে হবে। স্যুটকেস খুলে সে বলল— কালো প্যান্টটা দিব ?

দে।

—নতুন হাওয়াইটা দি ?

—দে। যা ইচ্ছে দে। বিরক্ত করিস নে।

হরিয়া প্যান্ট সার্ট পাট খুলে হ্যাংগারে ঝুলিয়ে রেখে গেল। আনন্দ বসে রইল। চুপ করে বসে রইল। কেমন হয়ে গেল যেন। বাইরে দুটো বিপরীত রঙে মিলে সাদা রঙ হয় না। কালোও হয় না। সাদা কালো দুটোতে মেশালে কালচে হয়, সাদাটা কমজোরী হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের মনে তার থেকেও বিচিত্র কিছু হয়। রঙছুট রঙ, বর্ণহীন রঙ তো নেই বাইরের জগতে হয় না। মন কিন্তু সব রঙছুট হয়ে শূন্যরঙা হয়ে যায়। সাদাও না, কালোও না। ভালও না, মন্দও না। উল্লসিতও না, বিষণ্ণও না। তেমনি হয়ে গেছে তার মন। মেয়েটি তার খোঁজ করে গেছে। তাকে কিন্তু ডেকে দিতেও বলেনি, অর্থাৎ আগ্রহও ছিল না। ভাল খারাপ দুই মিশে মন এমনি হয়ে গেল। কল্পনাতেও মেয়েটিকে নিয়ে খেলা করতে পারছে না।

বাইরে কারা চিৎকার করে হরিবোল দিয়ে উঠল। বিকট চিৎকার—বল হরি—হরিবো-—ল। বল হরি, হরি—বো—ল। বল হরি—হরি—বোল। নাগাড় চিৎকার করে চলেছে। বিরক্ত হয়েই সে উঠে দাঁড়াল। হ্যাঁ, ছ'টা চ্যাংড়াতে একটা মড়া নিয়ে চলেছে। খুব দুঃস্থ কেউ মরেছে। খাটিয়াও জোটেনি। এরা পাড়ার বাউণ্ডুলে, মহানন্দে বিকট চিৎকারে হরিবোল দিয়ে মরণের কথা মনে পড়িয়ে ভয় দেখিযে ওরা চলে। অমৃতের উপাসক ওরা। মৃতসঞ্জীবনীরও উপাসক বটে তাতে সন্দেহ নেই। কবিরাজখানায় পাওয়া যায়।

র‍্যাবিশ। জানালাটা বন্ধ করে দিলে সে বিরক্তি ভরে।

সঙ্গে সঙ্গে ফ্রুরর্ শব্দে ঘরখানার স্তব্ধতা ভঙ্গ হলো। সঙ্গে সঙ্গে দুপুরের মতোই সেই আতঙ্কিত চ্রিরিক, চ্রিরিক, চ্রিরিক, চ্রিরিক। চড়ুইটা আবার কখন এসে ঢুকেছে। না, বেরিয়েই যায়নি? লক্ষ্য তো করেনি আনন্দ! এ তো জ্বালাতন করলে!

যা-—যা—। একপাল্লা জানালা সে খুলে দিলে।

পাখিটা বেরিয়ে গেল না, ওই খোলা পাল্লাটারই মাথায় বসল।—চ্রিরিক—চ্রিরিক। আনন্দের বিরক্তিটা একটু দ্রবীভূত হযে গেল চড়ুইটার ব্যাপার-স্যাপার দেখে। ও ভেবেছে কি? হঠাৎ আনন্দ সম্ভবত ঘরে কেউ নেই বলেই পাখিটার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলে—কি? দুপুরবেলা দরজা-জানালা বন্ধ করে তোমাকে আটকে রেখোছলাম— আমার সঙ্গে দুপুর বাস কবেছ বলে দাবি করছ না কি?

—চ্রিক চ্রিক চ্রিক।

- কি? কালকে মুঠোয় চেপে তোমাকে ঘাযেল করেছিলাম?

মৃদুস্বরে পাখিটা ডাকলে—চিনিক্। চিনিক্।

—উ—। হুঁ হুঁ। ভাল।

ঢং—ঢং—ঢং ছ'টা বাজছে। পাখিটা চ্রি-বি-ক শব্দ করে চঞ্চল চকিত গতিতে ঘবের মধ্যে ঢুকে ঘড়িটার উপর একটু উড়ে ঘড়িটার মাথায বসল এক ঘণ্টা আগের মতো। তারপর নেমে বসল ব্র্যাকেটের উপব।

ঢং ঢং ঢং-—

—চ্রিক—চ্রিক—চ্রিক—। ছ'টা বাজা শেষ করে ঘড়িটা শুধু পেন্ডুলামেব শব্দ করছে। পাখিটা বার তিনেক আবার চ্রিক চ্রিক শব্দ করে থামল। তারপর ঘড়িটার পেন্ডুলাম ঢাকা কাঁচটায দু'-তিনটে ঠোক্কর দিয়ে একটি দীর্ঘ চ্রি—রি—ক শব্দ কবে বেরিযে গেল।

শিশুর হাসি অথবা ফুলভরা গাছ দেখে যে হাসি সকালের আলোর স্পর্শে ফুল ফোটার মতো মানুষের মুখে ফুটে ওঠে—সেই হাসি মুখে মেখে আনন্দ চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিকেলের রোদ্দুরে সন্ধ্যার শেড্ পড়েছে।

পার্কের গাছগুলির পাতা কলকাতার প্রসিদ্ধ বৈকালিক ঝড়ো হাওযায় লুটোপুটি খাচ্ছে। পত্রহীন শিমূল জাতীয় গাছ থেকে সে হাওয়ায় ফুল খসছে। সেই ফুল কুড়োচ্ছে

ক'টি ছেলেমেয়ে। একটি যুবতী যেতে যেতে ফুলগাছটার তলায় গিয়ে একটা ফুল কুড়িয়ে তার ডোনাট খোপায় গুঁজলে। হেসে ফেললে আনন্দ। 'কালো চুলে রাঙা কোসোম হেরেছ কি নয়নে'। মনে পড়ে গেল তার। কিন্তু এ মেয়ে সুন্দরী, অন্তত গৌরাঙ্গী।

এঃ! কালো কৃষ্ণাঙ্গী মেয়েটি এসে ফিরে গেছে!

—গেলে না? সন্ধ্যা হয়ে গেল! হরিয়া এসেছে।

মুখ না ফিরিয়েই আনন্দ বললে—না।

—যাবে না?

—না।

– চা করব?

—কর।

হরিয়া চলে গেল। আনন্দ তাকিয়েই রইল সামনের দিকে। পার্কের ওপাশের বড় রাস্তার উপর বাস যাচ্ছে, আলো জ্বেলে যাচ্ছে। ক'টায় লাইটিংয়ের টাইম? সম্ভবত ছ'টায়। রাস্তার আলোগুলো কখন জ্বলে উঠেছে এতক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়ে আসায় বুঝতে পারা যাচ্ছে। এই ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের মধ্যে সারিবদ্ধ গাড়িগুলির চলন্ত আলো, বিশেষ করে ওই ওমাথার বাকটায় আশ্চর্য গতিশীল রূপের খেলা শুরু করে দিয়েছে। সব থেকে মনোহারী হয়েছে বাকের মাথায় গাড়িগুলির গতির মন্থরতা। পিচের রাস্তার উপর আলোগুলির প্রতিবিম্ব পড়েছে। এ এক আশ্চর্য শোভা। মধ্যে মধ্যে পার্কের গাছগুলির আড়াল। বা বা বা!

হরিয়া চা নিয়ে এল।—চা!

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আনন্দ বললে,—বাইরের বারান্দায় ইজিচেয়ারটা পেতে দে।

—দিচ্ছি। চা-টা কেমন? নতুন দিয়েছে দুকানদার।

—ভাল না খুব। প্যাকেট চা আনবি। ও সব লুজ চায়ের আজকেরটা ভাল হবে, কালকেরটা পচা হবে।

—উ বললে কি না খুব ভাল চা। ফিরত দিয়ে আসব। আমি বলে রেখেছি।

—তাই দিস।

তবুও হরিয়া দাঁড়িয়ে রইল। হরিয়ার—শুধু হরিয়ার কেন, হরিয়া মধুয়া যদুয়া থেকে হরিনাথ যদুনাথ এমন কি মাধবেন্দ্র যাদবেন্দ্র পর্যন্ত সকলেরই স্বভাব হলো কোন সঙ্কোচের কথা থাকলে বলতে এসেও বলতে না পেরে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা। তবে হরিয়ার কথা আলাদা। ও মনিবের সঙ্গর জন্যও অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকে। এমন ক্ষেত্রে আনন্দ যদি বলে, কিছু বলছিস্? তাতে হরিয়া বোকা হয়ে হেসে বলে, না এমনিই। আনন্দ হাসে। আজও আনন্দ বললে—কিছু বলছিস্?

তাতে হরিয়া বললে—মান্‌সো আনব?

—আনবি? তা আন।

হরিয়া বললে—আর—

—কি ?

– -ব্রান্ডির দুকানে যেতে হবে নাকি ? উ তো আটটাতে বন্ধ হয়ে যায়। বাইরে গেলে না ?

—না।

হরিয়া চলে গেল।

আনন্দ আবার ডাকলে—শোন, হরিয়া।

—যাই।

একটু পর এল হরিয়া। হরিয়া শৌখিন লোক। বাইরে সে কখনও প্যান্ট হাওয়াই সার্ট ছাড়া বের হয না। বাংলা বই পড়ে। ইংরেজী শিক্ষা পড়ে। ইংরেজী লেখা মক্‌সো করে। বছরে একবাব ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়ে ইংরেজীতে চিঠি লেখে, My dear Babu, I come home I well. Mother well. Go very soon সব থেকে ভাল লেখে শেষকালে you Pronam.

হরিয়া সেজেগুজেই এল। বললে-–বাইরে চেয়ার দিলাম।

—শোন। ব্রান্ডির দোকানে যাবি। পাইট না। ছোট কোয়ার্টার পাওয়া যায়, তাই আনবি।

—হুঁ।

—শিগ্‌গির ফিরবি। আর একটা ঝোলা নিয়ে যা। হাতে করে আনিস নে। এখানকাব লোক সব দেখে!

বাইরে বসে সে ওই পার্কের ওদিকের বড় রাস্তাটার বাকের মুখে মোটরের চলন্ত আলোর আশ্চর্য শোভাব দিকে তাকিয়েছিল। এই রূপের খেলাটি এর আগে সে না দেখেছে এমন নয়, কিন্তু আজই সে খেলা আনন্দের মনে ধরা পড়েছে। বিস্ময় বোধ করছে যে, এর আগে সে দেখেও দেখতে পাযনি। তবে সে সন্ধ্যেতে তো প্রায়দিনই বাসায় থাকে না। কাল ছিল। কিন্তু কাল মেজাজ ছিল অন্য মেজাজ। কালো মেয়ের মুখ—তাব সহানুভূতি মাখানো কথা; এ দুটো নিতান্তই কাল্‌চে চোরাবালি ;—তার উপর মদের নেশাব পাগলামি বশে কার্ডবোর্ডের গলিঘুঁচি— কোন কোনার এবং তারই সঙ্গে চিলেকোঠাওলা বাড়ি বানাতেই মত্ত ছিল। আজ বাড়িটা নেই, উড়েই যাক, আর ডুবেই যাক, গেছে। আজ চোখে পড়েছে। আজও মনটা মধ্যে মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠছে বাইরে বের হবার জন্য। হোটেলের বারে বন্ধুরা এতক্ষণ এসে জমে গেছে। বাক্যের অসিযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। যশোদাদা—অশ্লীল রসিকতার আমীর। এক একখানি ছাড়ছে—আর মদের গ্লাসের মদের নেশায বুঁদ হয়ে যাচ্ছে। হোয়াট নট যশোদা দুলাল সেন ? জার্নালিস্ট, সাহিত্যিক, লেফ্‌টিস্ট, পেন-ইংক আর্টিস্টও বটে। থিয়েটারের দূতও সাজে। তবে কিছু মূল্যবান কথা বলে যশোদাদা।—আশিকো পতা কাঁহা ? দিন কঁহি, রাত কঁহি। খাতা কেয়া ? পিতা

কেয়া?—পিতা জরুর দারু। যো মিলতা সোহি খাতা। না মিলে তো ভুখে মরে। পিয়ারী ক্যায়সা? গোরী তো গোরী, কালী তো কালী। যো নয়ী সোহি ভালি। আজ যো ভালি—কাল সো নহি; এই হলো সাচ্চা মডার্ন মানুষ। পথে চলে যশোদাদা আপন মনে কথা বলতে বলতে, নিঃশব্দে কথা বলে, হাসে, চোখ পাকায়, ভ্যাঙায়, কিন্তু আশ্চর্য, হাত ছোঁড়ে না, সে সস্তা প্যাঁচ নাকি সিনেমা বা থিয়েটারের নাটকে করে, একজনেব নাকে ছোঁড়া হাত লাগিয়ে দিযে, তাকে রাগিয়ে খানিকটা কমিক করিয়ে লোক হাসায়। যশোদাদা খুব মুখ নেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে আপন মনে কথা বলতে বলতে পথ চলছে—তুমি হঠাৎ সামনে এসে গেলে, দেখে আশ্চর্য হয়ে বললে—কি যশোদাদা?

সঙ্গে সঙ্গে যশোদাদা আত্মস্থ। মুহূর্তে একমুখ হেসে বলল—আরে! ছোট্ট এবং দ্রুত উচ্চারিত একটি—আরে!

—কি ব্যাপার? আপন মনে, মুখ নেড়ে নেড়ে—

—তবে আর 'আরে' বললাম কেন? মনে হলো একটা প্রেতাত্মা আসছে। মন্ত্র পডছিলুম, তা দেখি চোখের ভুল। প্রেতাত্মা নয় দুবাত্মা। মানে তুই। শ্রীমান আনন্দ।

হঠাৎ উঠে পডল আনন্দ। ঘরে গিয়ে পোশাক পরতে লাগল। প্যান্টটা বড ভাল কেটেছে! ক্রীম রঙের হাওয়াইটা—, না সাদা শার্ট পরে টাই বাঁধলে আঁজ। মুখখানা তোয়ালে দিয়ে ভাল করে ঘষে একটু ভ্যানিসিং ক্রীম মেখে নিলে! তারপর বুরুশটা চালিযে সামনের চুলগুলোকে ফাঁপিয়ে দিলে। গুড্। নট্ শুধু আনন্দ, বাট্ আনন্দকুমার। অক্ষরে অক্ষরে—মানে আক্ষরিক অর্থে সত্য। নিজেকে বেশ সুন্দব লাগছে পোশাকটায। বিপদ করেছে নাকটায—বড্ড ধাবালো। এমনি মন্দ লাগে না, কিন্তু ফটোতে নাকটা যেন জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়ে যায়। নিজের ছবিকেই সে বললে—নো হোপ্ সার। সিনেমা জগতে কুমার হয়ে নায়ক সাজবার নো হোপ্। তাতে দুঃখ করো না। ছবিতে মিছে অভিনয করে কি করবে? ছোড দো। পথে নেমে পড। বিংশ শতাব্দী। আজাদ হিন্দোস্তান। নয়া জিন্দিগী। সিঁথি টু চৌরঙ্গী—এমন কি রাজভবন অ্যাসেম্বলি হাউস পর্যন্ত অবাধ গতি। চৌরঙ্গীতে আনন্দলোক বানিয়ে খাও দাও আর যশোদাদা বলে—'মজেমে রহো। খাও পিও, পরদেশ যাও, ঘুমো, মহব্বতি করো, হররোজ নয়া মহব্বতি, বাস্। বাস্ এক রোজ মর্ যাও।' শেষে বলেন—জীবন রঙীন গ্যাস বেলুন। সুতোয় বাঁধা তে-কোণা। কেটে ভেসে পড়। ওঠ ওঠ, ভেসে বেড়াও। সুখ তাতেই! তারপর—ফট্। মানে কেটে গেলে। গ্যাস বায়ুমণ্ডলে মিশল। কট্টুট রবার এসে পডল ধুলো-মাটির ধরণীতে। বাস মিশে গেল।

বায়ুমণ্ডলে ভাসতে বেরিয়ে পডল আনন্দ—হরিয়া ফেরবামাত্র। ব্যাঙ্ক থেকে আনা টাকার দশটা রেখে বাদবাকি সবই প্যান্টের পকেটে পুরলে। হঠাৎ কি মনে হলো—জরদাওয়ালার ছবিটা নিলে। ও লোকটাকে দিয়ে যাবে। একটা বিজ্ঞাপন হবে—হ্যাঁ, কথার মানুষ বটে। নিজে এসে পৌঁছে দিয়ে যায়। এক ঢোক খেয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু এখান থেকে বাস ধরাই এক হাঙ্গামা। রাবিশ! জীবনটাই হাঙ্গামা

করে তুলেছে এরা। সমাজ গভর্নমেন্ট—সব—সব মিলেছে, জোট বেঁধেছে। সাধে মানুষ চেঁচায়, বলে—সব ররবাদ। সব ররবাদ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

বাসও চলছে হরদম। ভিড়েরও অন্ত নেই। আপিস ভেঙেছে কখন। আপিসের পর সব এদিক ওদিক সুখের সন্ধানে ঘুরে ব্যর্থ হয়ে ফিরছে। বাড়িতে অভাব-অশান্তি-অনটন অসুখ যন্ত্রণার শেষ নেই। স্ট্যান্ডে লোক দাঁড়িয়ে এক গাদা— সব চলছে। বাড়ির আবহাওয়া থেকে পালাচ্ছে।

সব ররবাদ।

ওদিক থেকে একখানা বাস এসে দাঁড়াল। লোক নামছে। এ দিকের বাসে সে উঠে বসল। হঠাৎ নজরে পড়ল লম্বা কালো মেয়ে— হাতে বেঁটে ছাতা। বাড়ি ফিরছে। রাত্রে ছাতা মাথায় দেয়নি, নতমুখী হয়ে চলেছে।

নামবে? না। পেটের মধ্যে ঢোক্‌টা চন চন করছে। বাবিশ। চলো—। মনে মনে বলতে বলতেই বাসখানা ছেড়ে দিলে। ওই চলছে—লম্বা পা খাটো খাটো করে ফেলে চলছে। হ্যাঁ, স্টাইল একটা আবিষ্কার করেছে বটে। রূপ না থাকলে স্টাইল ভিন্ন বাঁচো কি করে?

কালো মেয়ে তার উপর ঢ্যাঙা। চলনটা ওর স্টাইলই বটে। তবে নিজে থেকে ওটা ও আবিষ্কার এবং আয়ত্ত করেনি। ধমকে শাসনে আবিষ্কৃত হয়েছে। ধমক এবং শাসনের জন্যে আয়ত্ত হয়ে এখন ওইটেই ওর অকৃত্রিম চলনে দাঁড়িয়েছে। লম্বা পায়ে দীর্ঘপদক্ষেপে যখন ও চলত আট দশ বছর বয়সে তখন মা ধমকাতো। একে তো রঙ কাঠকয়লা তারপর ঢ্যাঙা তালগাছ। পাগুলো সরু সরু তাতে চলছে এই পা ফেলে। যেন হার্ডগিলে কাদাখোঁচা পাখি চলছে। খাটো —পায়ের চলন খাটো! ছোট করে ফেল। তখন ফ্রক পরত। ফ্রকে ওকে খুব খারাপ লাগতো। কিন্তু শাড়ি! পাবে কোথায়? জুটবে কি থেকে? বাপ ইস্কুল মাস্টারি করত, তাও নীচের ক্লাসের মাস্টার। মাইনে ছিল ষাট, তারপর যুদ্ধের সময় কিছু বেড়েছিল মাগ্‌গি ভাতা হিসেবে। দেশ স্বাধীন হতে সাড়ে তিনশোর বুই হয়েছিল। সংসার বড় ছিল না, একছেলে একমেয়ে, মেয়েই ছোট। সুবাহর মধ্যে সিঁথিতে বাড়ি ওদের দু'পুরুষের, বাড়ি ভাড়া লাগত না। চলে যেত কোনরকমে। মা আবশ্যি মনসা পড়ার কথার মনসার মতো বিষ ঢালত, খেতো আবার উগলাতো। শ্যামলীর ইস্কুল মাস্টার বাপ কালো মেয়ের নাম রেখেছিলো শ্যামলী। বাপকে মা বলতো- পোড়াকাঠ। বাপ মেয়ের মতোই কালো এবং লম্বা ছিল, ছেলেও তাই কিন্তু ছেলের কালো রঙ তখনও সমাজে সংসারে সমস্যা ছিল না। শ্যামলীর বাপ হেসে বলতো—দেখ আমাকে মদনমোহন বলতে বলছি না, তবে পোড়াকাঠ শব্দটা একটু সরস করে বলতে পার না। আমারও ভাল লাগে, পাঁচজনের কাছেও তোমাকে পতিনিন্দার দোষভাগিনী হতে হয় না। শুকনো কাঠ তাকে শুষ্কং কাষ্ঠং ও বলা যায় আবার নীরস তরুবরও বলা যায়। কালাচাঁদ বললে তো পার। কাঠ বলতেই যদি চাও তবে তমাল তরুও বলতে পার।

মা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠত। আর একটা সম্বোধন তার ছিল —সেটা মড়ুইপোড়া।

তিনি ওই নাম দিয়ে শুরু করতেন—মড়ুইপোড়ার বাক্যি শোন। মড়ুইপোড়া কালাচাঁদ! সে কৃষ্ণের শতনাম থেকেও বড় একটা গালাগাল পর্ব।

বাপ মারা গেল হার্টফেল করে, শ্যামলী তখন ষোল বছরের। উনিশশো বাহান্ন সালে মাথায় প্রায় চার ফুট ন-দশ ইঞ্চি হয়ে উঠেছে। ইস্কুলে পড়ত। ছাত্রী হিসেবে মাঝারি, তবুও দরিদ্র ইস্কুল মাস্টারের মেয়ে এবং পুরনো বাসিন্দে বটে —তার জন্যে ইস্কুলে ফ্রিশিপ জুটেছিল। মা এই সময়টায় উঠতে বসতে তাকে ধমকে ধমকে এই চলনে অভ্যস্ত করেছিলেন। বাড়ির উঠোনে তাকে নিজের চোখের সামনে হাঁটিয়ে অভ্যাস করাতেন। তখন শাড়ি পেয়েছে। বাপ সাদা মিলের শাড়ি কিনে দিতেন। তাই পরত। বাপ মারা গেল, শ্যামলী ফেল করলে ম্যাট্রিকে; মা তাকে হেঁসেলে ঢোকালে, আর ভাইকে বললে—যেমন তেমন করে যা হোক একটা পাত্তর জোটা। বিয়ে তো দিতে হবে। ভাইও ম্যাট্রিক ফেল, তবলা বাজনায় খুব ভাল হাত, তবলা বাজায় থিয়েটারে, কলকাতার মিউজিক সেন্টারে তবলা শেখায়, মধ্যে মধ্যে সিনেমায় লম্বা সিটকে মানুষের পার্ট করে। তার সময়ও ছিল না—তাগিদও ছিল না। এবং মায়ের থেকে বুদ্ধি একটু বেশি। বিয়ের চেষ্টা সে করেনি। চমৎকার কাজ একটা তাকে জুটিয়ে দিয়েছিল। কোত্থেকে কে বুদ্ধি দিয়েছিল শ্যামলী জানে না, তবে একদিন কাপড়কাচা সাবানের এক মালিক ভদ্রলোকের বাড়ি তাকে নিয়ে গিয়ে সাবান ক্যানভাসিংয়ের কাজ জুটিয়ে দিয়েছিল। কালো মেয়ে, ধবধবে সাদা কাপড় জামা পরে লোকের বাড়ি বাড়ি যেতে হবে এবং এই সাবানের গুণ বর্ণনা করতে হবে। হাল আমলে এসব সাবানের নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে যাতে সাবান খানিকটা জলে ফেলে হাত দিয়ে নাড়া দিলেই ফেনা হয় এবং তার মধ্যে কাপড় ফেলে দিয়ে কিছু ডুবিয়ে রেখে তুলে নিংড়ে নাও, বাস হয়ে গেল। একেবারে বকের পালক হয়ে যাবে। সাবানটার নামও দিয়েছে কোম্পানি 'বলাকা'।

তিনটে-সাড়ে তিনটের সময় বের হয় শ্যামলী। সতের বছর থেকে এখন চব্বিশ পার হতে চলেছে। উনিশশো ষাট সাল; আট বছরে শ্যামলী চাকরির পথে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে। একটা হলো, সকালে বা ভর্তি দুপুরে গৃহস্থ বাড়িতে ক্যানভাসিং এ গেলে বিপরীত ফল হয়। সকালে কাজকর্ম —আফিস ইস্কুলের ব্যবস্থা— দুপুরে মেয়েদের খাওয়া বিশ্রাম, এর মধ্যে গেলেই তাদের মেজাজ বেগড়ায়। সাড়ে তিনটে থেকে পাঁচটা তাদের মেজাজ ভাল থাকে। ব্যাটাছেলেদের কাছে সে তার কালো চেহারা নিয়ে গেলে তারা চটে। মেয়েরা খুশিও হয় করুণাও করে। ছাতাটা সে নিজেকে আড়াল দেবার জন্যে ব্যবহার শুরু করেনি—করেছিল রোদ্দুরের জন্যে। ব্যবহার করতে করতে সে বুঝেছে এতে মাথায় রোদ লাগে না, কালো মুখ ঘামে চকচক করে আরও খারাপ দেখায় না তো বটেই তা ছাড়াও পথচারীরা একটু তাকায় তার দিকে। তাকে দেখতে চেষ্টা করে এবং দু'-চার জন ঔৎসুক্যবশত খানিকটা পথ পিছন পিছন কি সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে। হাতে-পায়ের কালো রং সবাই দেখতে পায়, সে কালো জেনেও সঙ্গ নেয়—তার ওই চলনের স্টাইলের জন্যে।

লোকে এজন্যে ব্যঙ্গও করে কেউ—বাপরে, কেউ ছোট্ট একটি—হুঃ, কেউ—মাইগড, কেউ কিছু কেউ কিছু, যারা একদিন দেখেছে, তারা—ওইরে! বা ওই যায়!—বলে ওঠে। তাতে প্রথম প্রথম সে আহত হত, নিষ্ঠুরতম ব্যঙ্গ শুনে এক একদিন তখন জলও আসত চোখে কিন্তু এখন আর আসে না; বরং একটু কৌতুকই অনুভব করে। বাংলা বইও সে পড়ে। পড়ে শুনে জীবনের সূক্ষ্মবোধগুলিও তার কিছু কিছু জেগেছে। সে জানে এর থেকে মর্মান্তিক লজ্জা, হয়তো অপমান কোন মেয়ের পক্ষে হতে পারে না, তবুও সে আত্মসংবরণ করতে পারে না,—ছাতা মাথায় দিয়ে—এই চলনেই হাঁটে। তবে তার চুলের রাশি দেখে তারিফ সবাই করে। চুল সে অধিকাংশ দিনই এলো রাখে। ডোনাটে খোপা এত বড় হয় যে তাকে আরও বিশ্রী করে তোলে। এলো খোপাও একটি তালের মতো হয়। মধ্যে মধ্যে একটা বেণী করে ডগার দিকটা এলিয়ে দেয়। তেল সে মাখে না, তাতে কালো রঙ চক্ চক্ করে— খারাপ দেখায়।

বাংলা 'কবি' বইটা তার খুব ভাল লাগে। তার কারণ কবির নায়িকা ঠাকুরঝি তারই মতো কালো মেয়ে। আর ভাল লাগে শরদিন্দুবাবুর একটি গল্প। তাতে ধনী বিদ্বান নায়ক ছদ্ম পরিচয়ে দুটি মেয়েকে পড়াতে এসে সুন্দরটিকে ফেলে কালো মেয়েটিকেই পছন্দ করে বিয়ে করলে। সে কালো মেয়েরও তারই মতো একরাশি চুল। সে মেয়ে নিজেকে উপেক্ষিতা ভেবে যখন টেবিলে মাথা রেখে কাঁদছিল তখনই নায়ক এসে বললে কর্তাদের মত নিয়ে এসেছি, এখন তোমার মত চাই। কিন্তু কাঁদছ কেন? আর যদিই কাঁদছ তবে চুল এলিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে কাঁদো। কারণ কবি কালিদাস বলেছেন কাঁদতেই যদি হয় তবে চুল এলিয়ে কাঁদো।

সে চুল এলোই রাখে। কিন্তু কাঁদবার অবকাশ হয়নি, হবে না। তবুও সে এটুকু ছাড়তে পারে না। মধ্যে মধ্যে কটূক্তি শুনে ভাবে ছি। তারপর ভুলে যায়। এ সেই অতি দরিদ্রের নিয়মিত চার আনা দামের লটারীর টিকিট কাটা! কোন বারই পায় না এবং তার ভাগ্যকেও সে স্থির জানে কখনও পাবে না তবু কিনেই যায়, কিনেই যায়। লজ্জা তার রূপ, লজ্জা তার দারিদ্র্যে, লজ্জা তার এই ভাবে হাঁটা, লজ্জা তার বাড়ি বাড়ি গিয়ে গিন্নীদের স্তব করা, সব জড়িয়ে গোটা জীবনটাই তার লজ্জা— তার সঙ্গে এ লজ্জাটাকেও সে মাথায় করে নিয়েছে।

মধ্যে মধ্যে দুষ্ট মানুষ আসে। কুৎসিত প্রস্তাব নিয়ে। সে কিন্তু তাও নিতে পারে না। কালনাগিনীর মতো ফোঁস করে ওঠে। চোখ দপ্ দপ্ করে জ্বলে।

কয়েক বারই এমন ঘটেছে।

নিজেকে তারপর প্রশ্ন করেছে, তাহলে এমন করে হাটে কেন? এমন ছাতা ঢেকে চলেই বা কেন? বর্ষার সময় নীলচে প্ল্যাস্টিকের বর্ষাতি আর টুপি পরে। কোম্পানি অর্ধেক দাম দিয়েছে। তার উপরেও সে ছাতা ঢাকা দেয়।

তার আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর সে পায়নি, দিতে পারেনি।

না—এও সে চায় না। আবার ওইটুকুও ছাড়তে পারবে না।

এই সব কারণে সে কখনও চৌরঙ্গীর দিকে হাঁটে না। সন্ধ্যের পর তো নয়ই।

সন্ধ্যের পর এক ঘণ্টা আর একটা কাজ করে সে। সাবান কোম্পানির বুড়ো ম্যানেজারের বাচ্চা নাতিকে পড়াতে হয়। পনের টাকা দেন বৃদ্ধ। আটটায় সে বাড়ি ফিরে আসে।

* * *

পথে পড়ে এই ভদ্রলোকের বাড়ি। নতুন নতুন বাড়ি হচ্ছে, বাগান ভেঙে বসতি বসেছে, পথঘাট আলো ঝকঝকে সব বাড়ি। মাঝখানে পার্ক রেখে নতুন এইখানটা একেবারে বালিগঞ্জের মতো হয়ে উঠেছে। পাড়াপড়শী পুরনো বাসিন্দেরা এখানকার জায়গা বিক্রি করে ক্রমে ক্রমে উত্তরে সরছে। ওরা এখনও বাড়ি বিক্রি করেনি। বিক্রি হযে যেতো কিন্তু এক খুড়ো আছে, তার বাপের সহোদর, সে সন্ন্যেসী হযে গেছে। মধ্যে মধ্যে আসে, মরেনি বলে কেউ কেনে না। তার মা দিনরাতই বলে—মরে না। আবার মধ্যে মধ্যে বলে—তা মরেনি বলেই আছে, নইলে বাদল তো বিক্রি করে দিয়ে টাকা নিযে সরে পড়ত। পথে বসতে হত। মেয়ের বিয়ের ভরসা আর করে না মা। বরং এই তার ভাল হয়েছে। বাদল তবলা বাজায, রোজগারও করে কিন্তু তার অনেকটাই যায তার বাইরের টানে। নইলে ভাল। নেশা কবে না, বাবুগিরিও নেই, শুধু থিয়েটারেব নাচিয়ে আশার ওখানে আড্ডা তার পাকা। ভোরবেলা বাড়ি ফেরে, বারোটা পর্যন্ত থাকে, খেয়ে-দেয়েই বেরিযে যায়। বলে থিয়েটারে যাচ্ছে। কিন্তু আশার বাড়ি দিবানিদ্রা দেয গিয়ে। সেখান থেকে থিয়েটারে। আর সিনেমার কাজে ডাক থাকলে তো কথাই নেই—দশটাতেই বেবিযে যায। মাসে পঞ্চাশ টাকা দেয, তার বেশি সে দেয না। বললে—চুপ কবেই থাকে। বেশি বললে বলে—একটা পেট একবেলা পঞ্চাশ টাকার বেশি কি লাগে বল ? আর শ্যামলীর তো একটা পথ আমিই কবে দিযেছি। ও তো মাসে ক্যানভাসিংয়ে টুইশনি করে পচাত্তর আশী টাকা পায়।

এরপরও কথা বললে—পরের দিন থেকে আসাই বন্ধ করে। খুঁজতে যেতে হয় শ্যামলীকে। আনন্দেব বাসার ধার দিযে পথটাই ভাল পথ, চওড়া পথ, ভদ্র পথ। এই পথেই সে যায আসে। তাছাড়া এ পথ দিয়ে যেতেও তার ভাল লাগে। বাংলা বইযেব সে ক্ষুধার্ত পাঠিকা, বই সে গোগ্রাসে গেলে। এ পথে ক'জন লেখক এসে বাড়ি করেছেন বাসা নিয়েছেন। তাদের বাড়ির ধার দিযে যেতেও ভাল লাগে। মধ্যে মধ্যে দেখতেও পায়। কেউ বারান্দায বসে থাকেন। কাউকে দেখা যায় জানালার মধ্যে দিযে। কাছে যেতে বা গিয়ে আলাপ করতে সাহস পায না। তাদের বাড়িগুলি পার হযে আরও খানকটা এগিয়ে একতলা একখানি ছোট বাড়ি, সেই বাড়িতে এসেছেন এই ভদ্রলোক, তারপরই পার্ক শেষ। ওদিকে একটা বড রাস্তা চলে গেছে এ রাস্তাটা তার সঙ্গেই মিশেছে জ্যামিতির সমকোণ সৃষ্টির উর্ধ্ব রেখার মতো। সে রাস্তাটা সোজা পার হলেই পুরনো কালেব পাড়া শুরু। ছোট অপ্রশস্ত রাস্তা। আঁকাবাঁকা। দু' পাশে পচা ড্রেন। এরই মধ্যে দিযে গিয়ে তাদের নোনাধরা পলেস্তারা খসা পুরনো বাড়ি। উঠোনে একটা পেয়ারা গাছ। ফাটা খোয়া ওঠা উঠোনে দর্বাঘাস মথো ঘাস। যেখানে

সান আছে সেখানে শ্যাওলা। তার দু'পাশে ঘর। একদিকে একখানা ছাদ-ফাটা দরদালান, তার কোলে দু'খানা ঘর, অন্যদিকে একখানা ছাদ-ফাটা দরদালান, তার কোলে দু'খানা ঘর, অন্যদিকে একখানা রান্নাঘর, একটা ভাঙা চাল। অন্য একদিকে খাটা পাইখানা। অন্য একদিকে পাঁচিল।

এই নতুন একতলা বাড়িটা নাকি এক অভিনেত্রীব। তার বাড়ি হচ্ছে খবরটা দিয়েছিল তার দাদা। সেদিন খুব আগ্রহ হযেছিল তার। দাদাব দৌলতে থিয়েটারটা দেখতে পায় মধ্যে মধ্যে। এই অভিনেত্রীব অভিনয সে দেখেছে। নামও তার খুব। পথ দিযে যেতে আসতে আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য কবত আব কত বাকি। একদিন শেষ হলো। যেতে যেতে থমকে দাঁড়িযে কাছ থেকে দেখত। বাস্তাব উপবেই বাড়ি, দেখতে অসুবিধা ছিল না। দাঁড়িযে দেখত কি বড একটা জানালা। আব তাব কোলে প্রায ছোট্ট একটা ঘরের মতোই চৌকো একটি বারান্দা। বাবান্দা ঘিবে গ্রিলের মতো বেডা পড়ল। পর্দা ফেলে দিলেই ঘ৲। চমৎকাব। দাঁড়িযে দেখত আব নতুন বঙেব গন্ধ শুঁকত। ভাবী মিষ্টি লাগে তাব। তাবপব বাড়ি বন্ধই বইল। দাদা বললে সুভদ্রা দেবী এখানে আসবে না বাস কবতে। ভাডা দেবে বাড়ি। হতাশ হযেছিল। যাঃ। ইনি এলে হাজাব হোক মেযেছেলে কাছে যেতে পাবত, দাদাব সূত্র ধবেও আলাপ করত। একজন বিখ্যাত লোকেব সঙ্গে আলাপ হত। নিজেব জীবন তো সবটাই দৈন্য। সে তো মুছবাব নয। কোন সম্বলই তো নেই তাব। শুধু মধ্যে মধ্যে মনে হয এ আব ভাল লাগছে না! কর্পোরেশনে টিকেদাবী কবে তাব পবিচিত একটি বন্ধু, তার জন্যে দবখাস্ত কবলে হয। কখনও ভাবে নার্স হলে হয। কিন্তু সে হয না। হবেও না। বড নিরুৎসব ঠেকে জীবন। তবু এই বিখ্যাত মহিলাব সঙ্গে দেখা হলে ভাল লাগত। তাঁকে ধবে অভিনয শিখতে পাবত। কা৲ া বঙ আটকায না পেন্টেব দৌলতে। তা এলেন না তিনি। হঠাৎ একদিন দেখা গেল এই মাস দেডেক আগে বাড়িতে লোক এসেছে। সে ছাতাব আড়াল থেকেই দেখলে বাবান্দাটায টবেব গাছ ঝুলিযে দিযেছে। ছবি টাঙানো হচ্ছে। অনেক ছবি। একজন পাজামা-পাঞ্জাবি পবা উস্কোখুস্কো চুল মানুষ ছবি টাঙাচ্ছে।

তাবপব শুনলে লোকটি নাকি শিল্পী। ছবি আঁকে। ছোট গেটটায বেশ চমৎকাব কবে কাঠেব প্লেটে লেখা আনন্দ বায়— আর্টিস্ট। নাম সে শোনেনি। শিল্পেব খোঁজ সে বড একটা বাখে না। সামর্থ্যই বা কোথায আর অবসবই বা কোথায? তবে ছবি সে ভালবাসে। মাসিক পত্রে ক্যালেন্ডাবে আঁকা ছবি খুব ভাল লাগলে বাঁধিযে ঘবে টাঙায। সেও সহজ ব্যাপাব নয। ফ্রেম কাঁচ বাঁধাই খবচ আছে। বাড়িতে মাযের পুজোব জাযগায ঠাকুবেব ছবি আছে। অনেক ঠাকুব। সে বেছে বেছে প্রাকৃতিক দৃশ্য পেলে বাড়িব পুবনো আমলেব ফ্রেমেব কাঁচ নিযে পুবনো ছবি ফেলে দিযে নিজেই বাঁধিযে টাঙায। শিল্পীদেব মধ্যে নন্দলাল বসু, যামিনী বায, দেবীপ্রসাদ বাযচৌধবী, গোপাল ঘোষেব নাম শুনেছে। অবনীন্দ্রনাথেব নাম সব থেকে উঁচুতে তাও জানে। সন্ধ্যাবেলা ফার্মেব ম্যানেজাবেব বাড়িতে তাঁর নাতিকে পড়াতে গিযে

কাগজ পড়তে পায়। রবিবারের কাগজে সাপ্তাহিকীর পাতাগুলি বাড়ি নিয়ে এসে খুঁটিয়ে পড়ে। তারই মধ্যে এদের কথা অনেক থাকে। আনন্দ রায় নতুন। এ কালের ছবি সব সে বুঝতে পারে না। তবুও দু'-চারটে ভাল লাগে রঙের জন্য। আনন্দ রায়ের জানালা প্রায় বন্ধ থাকে। বাইরের বারান্দায় ছবিগুলো সে তিনটের সময় বেরুবার পথে কয়েক দিনই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে গেছে। ছবিগুলো কেমন জড়ানো জটিল, বেশ কিছুক্ষণ না দেখলে বোঝা যায় না, হেঁয়ালির মতো। কিন্তু রঙ বড় ঝক্‌মকে। লাল নীল গাঢ় হলুদে যেন ঝলমল করে। আরও ভাল লাগে সাজানোর ব্যাপারটা। কি চমৎকার সাজানোর ভঙ্গি। কটিই বা জিনিস। একটা উঁচু টুলে একটা এবড়ো-খেবড়ো বিচিত্র কাঠের গুঁড়ি, কিন্তু দূর থেকে মনে হয় একটা জন্তু! কাছে গেলে বুঝতে পারে কাঠের গুঁড়িতে ত্রিভুজের মতো তিনটে খোঁদড় তার দুটোতে চোখ আঁকা, একটাতে মুখ। দুটো টুলের উপর দুটি ফুলের টব। বারান্দায় ছাজার মাথায় কয়েকটা ঝোলান টব। মাঝখানে দু'খানি চেয়ার একটি ছোট্ট টেবিল। টেবিলে একটা বেশ ফাপা বাঁশের ফুলদানী। বাঁশই তবে মাঝখানে চমৎকার নক্সা আঁকা। বোধহয় নিজেই এঁকেছে। দেখে কতদিন ভেবেছে এ সব তো সস্তা জিনিস, এ দিয়ে তাদের একখানা ঘর, যেখানা নামে দাদার জন্য, আসলে পড়ে থাকে----সে ঘরখানা এমনই করে সাজানো যায় না। তাতেও মায়ের বাধা, হাঁ-হাঁ করে উঠবে। পুরনো আমলের ভাঙা খাট, তার তলায় ভাঙা কুলো, ভাঙা চ্যাঙারি, ঘুটের ঝুড়ি, বাজ্যের জিনিস। সে সব বস্তুগুলির প্রত্যেকটি মায়ের বুকের এক একখানি পাঁজরা! অথচ নিত্য দেখে যায় আর এমনই একটি বাসনা, গোপন বাসনা বুকের মধ্যে পুষে নিয়ে যায়, কিন্তু সে বেশিক্ষণের জন্য নয়; এখান থেকে রেল পুল পার হয়ে ওপারে খালের পুল পর্যন্ত যেতে যেতেই শেষ হয়ে যায়। আপনা-আপনিই ভুলে যায়। আর একটি আফসোস জাগে সেটা বন্ধ বড় জানালাটা। সেই প্রথম দিন সে আনন্দ রায়কে ছবি টাঙাতে দেখেছে তার পর আর দেখেনি। উস্কোখুস্কো রুক্ষ বড় বড় চুল, বেশ লম্বা চেহারা, একটু রোগা। মুখখানা কেমন কড়া, চোখের কোণে কালি, লোকটাকে ভয়ও করে আবার মন্দও লাগে না। ভালই লেগেছিল। ব্যাটাছেলের চেহারা ননীগোপাল হলে মানাবে কেন? আনন্দ রায়কে আর দেখেনি, এই কাল পর্যন্ত আর জানালাটাও খোলা দেখেনি। ওই ঘরখানাতে একটু উঁকি মেরে ওর দেখবার ইচ্ছে ছিল। এবং আনন্দ রায়কে ভাল করে একটু দেখতে। তা হয়নি। এই কাল হয়ে গেল সে সুযোগ। ছাতা আড়াল দিয়ে চলে বটে সে কিন্তু ওর মধ্যে থেকে বাইরের দুই পাশ, সামনের সব কিছুই সে দেখে নেবার একটি সুকৌশল আবিষ্কার করে নিয়েছে সেই ঈশপের গল্পের তৃষ্ণার্ত কাকপক্ষীটির মতো। সে যেমন জল খেতে এসে একটা পাত্রের কানায় বসে দেখলে জল অনেক নীচে তার ঠোঁটের নাগালের বাইরে, তখন সে যেমন নুড়ি কুড়িয়ে কুড়িয়ে পাত্রের তলায় ফেলে জলকে নাগালের মধ্যে এনেছিল তেমনি সেও তার এই বিশেষ ভঙ্গির চলনের দোলার সঙ্গে ছাতাটিকে এক একবার এমনভাবে অল্প পিছনের দিকে চকিতের জন্য ফেলে যে আশপাশ সামনের সবকিছু দেখে নিতে

পারে। কাল সে একটু দূর থেকেই প্রথমটা দেখেছিল জানালার পাল্লা বাইরের দিকে খোলা রয়েছে। মনটা কৌতূহলী এবং খুশি হয়ে উঠেছিল। এবং আরও একবার ছাতাটা পিছনে ফেলে দেখে না নিয়ে পারেনি। দ্রুত চলন আরও একটু দ্রুত করে হেঁটেছিল। তার পরের বার দেখতে পেয়েছিল আনন্দকে। সে দেখেছিল ভদ্রলোকের চোখ তার দিকেই। বুকটা একবার ধড়াস করে উঠে ঢিব ঢিব করতে শুরু করেছিল। মনে ঠিক কি হয়েছিল বলতে পারবে না, হয়তো লজ্জা হয়তো তার কালো বোগা মুখখানাকে ভাল করে ঢাকবার জন্যেই সে ছাতাটা একটু বেশি নামিয়ে নিজেকে ঢাকতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ঘটল কাণ্ডটা। কাকটা একেবারে সামনে ছোঁ মেরে এসে পড়ল, চড়ুইটা চকিত, একটি জোরে ছোড়া কিছুর মতো আগেই বেরিয়ে গেছে। আবছা দেখেছিল ঠিক নয়, মনে হয়েছিল। তার পিছনে কাকটা কালো পাখায় শব্দ তুলে আশ্চর্য একটা আঁকাবাঁকা গতিতে ছাতার কিনারা ঘেঁষে চলে গেল। চমকে উঠে স্বাভাবিকভাবেই ছাতাটা একেবারে পিছনে ঠেলে দিয়ে নিজেকে অনাবৃত করে দিলে--মাঃ! সঙ্গে সঙ্গে শুনলে---অঃ শব্দ! ক্ষুব্ধ এবং যন্ত্রণা-কাতর একটি মোটা গলার অঃ! উঃ! এবং আঃ! যেন মিশে গেছে একসঙ্গে। সে তাকালে সেই দিকে, সেই জানালাটার দিকে। শিউরে উঠল সে! ইস্! – শিল্পী আনন্দ রায়ের চোখ থেকে রক্তের ফোঁটা ঝরছে। কেউ বোধ হয় ঢেলা ছুঁড়েছিল কাকটার দিকে, সেটা ছুটে গিয়ে আনন্দ রায়ের চোখে লেগেছে। তাই বোধ হয় কাকটা ঢেলা এড়িয়ে এমন গোত্তা খেয়ে নিচে নেমে এঁকেবেঁকে এমনভাবে বেরিয়ে গেল। আনন্দ রায়ের চোখে রক্ত পড়তে দেখে ঢেলা লেগেছে বলে শিউরে উঠে বলে উঠেছিল---ইস্! আপনার চোখ থেকে যে রক্ত পড়ছে! ঠিক কি বলেছিল মনে নেই। কিন্তু আনন্দ রায় যখন হাতের তালুর উপরে চড়ুইটা দেখিয়ে একটু হেসে বলেছিল একটা চড়ুই! সে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। একটা পিঁপড়ে হঠাৎ কামড়ালে মানুষ চমকে উঠে সেটাকে টিপে ধরে মেরে দেয়। কেউ আগে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তারপর দেখে কঠিন আক্রোশে মেঝের উপর দলে দেয়। লোকটি বিচিত্র। হেসে বেশ স্নেহের সঙ্গে বললে---চড়ুই। তাকে জল দিয়ে বাচাতে ব্যস্ত হলো। সযত্নে কোথায় যেন তুলে রেখে দিলে। তার ইচ্ছে হয়েছিল— ঘরে গিয়ে চোখটা ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে দেয়। কিন্তু এতটা সে পারেনি। লজ্জা পেয়েছিল। আর বলবার কথা না পেয়ে চলে গিয়েছিল। রাত্রে কাল ফিরবার সময়ও সে থমকে দাঁড়িয়েছিল। ভেবেছিল খোঁজ নিয়ে যাবে--ডাক্তার দেখিয়েছেন কিনা। যা হোক —সে তার ওই 'একটা চড়ুই' কথাতেই সে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু লজ্জায় পারেনি। কি ভাববেন? তাছাড়া পাড়ার লোক, তারা তো এতেই নানান রটনা করে। নাম দিয়েছে দালাল কালী। আর তাকে নিয়ে যে সব গল্প তৈরি করে তা শুনে তার মতো ক্যানভাসার মেয়েও লজ্জা পায়।

আজ দুপুরবেলা জানালা বন্ধ ছিল। ভেবেছিল কি লোক, বেরিয়ে গেছেন এই চোখ নিয়েই! তবে ভাল নিশ্চয় আছেন অনুমান করতে হয়নি। ভাল না থাকলে বেরুলেন কি করে? হাসপাতাল টাসপাতাল যেতে হয়নি তো? না এতদূর হবে

না। একটু দাঁড়িয়ে সে এসে কড়া নেড়েছিল। চাকবটা তো আছেই। তাকে জিজ্ঞাসা করে যাই। বাড়িতে না থাকলে বাড়িব ভিতবটা দেখতে চাইবে? না। সে থাক। চাকবটা যদি বলে হুকুম নাই। তাব থেকে জিজ্ঞাসা করে আর দুটো খবর নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু উনি ঘবে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন এবং ভাল আছেন শুনেই পালিয়েছিল। থাক বাবা।

বাড়ি ফিববাব পথে সে আবাব দাঁড়াল।

জানালাটা খোলা আছে তবে ভিতবটা অন্ধকাব। এপাশেব চাবফুট গলিটার ভিতবের বান্নাঘবেব একটা জানাল' দিয়ে আলো বেকচ্ছে। চাকবটা বয়েছে— বান্না-বান্না কবছে। আনন্দ বায নেই। চলে গেছেন বেবিয়ে। হযতো সিনেমায হযতো তাঁদেব আড্ডায কিংবা হযতো কোন আত্মীযেব বাড়ি নযতো শ্বশুববাড়ি। কলকাতাতেই শ্বশুববাড়ি, বউ এখন সেখানে গেছেন। বাসায কোন মেয়েছেলে নেই। একা থাকেন। একলা কেন থাকেন কে জানে? কেউ নেই? হতে পাবে। না পাবে না। কেউ নেই তো বাসা কেন? কাব জন্যে বাসা? দিব্যি তো ভাল ভাল মেস আছে, বোর্ডিং আছে, আজকাল হোটেল বযেছে। সেখানে তো বিনা ঝঞ্ঝাটে থাকতে পাবেন। বাসাব তো ঝঞ্ঝাট আছে। বান্নাবান্না নিয়ে একটা সংসাব। একটা চাকব। নিশ্চয বাসায থাকবাব মতো কেউ আছে। ঘবখানা দেখতে পেলে ঠিক ধবতে পাবত। তবে সে বেশ অনুমান কবতে পাবে ঘবখানাব পাশাপাশি দুটো খাট জোড়া দেওয়া আছে। নইলে ছোট হোক দু'খানা ঘবেব কি প্রয়োজন! ভাবতে ভাবতেই সে চলতে শুরু করেছিল।

বড় বাস্তাটা পাব হযে গলিপথে ঢুকল। গ্যাসেব বাতি ঘুচে ইলেকট্রিক হযে জীবনে ঐশ্বর্য বেড়েছে। কথাটা শুনতে ভাল লাগে, যখন প্রথম ইলেকট্রিক আসে তখন সবাই বলেছিল বাচলাম। সেও খুশি হয়েছিল। এ তো তাব আমলেই হলো। তখন সদ্য বাবা মাবা গেছেন। কিন্তু আলো হযে দুঃখ আবও বেড়েছে। গ্যাসেব আলো যতগুলো ছিল ততগুলো তো দেয়নি। পথ আবও অন্ধকাব হয়েছে। অন্য লোকেবা অনেকে বাড়িতে ইলেকট্রিক নিয়ে সুখ পেয়েছে নিশ্চয, সুইচ্ টিপলেই আলো, উজ্জ্বল আলো। কিন্তু তাদেব মতো লোকেব বাড়িতে এখনও সেই হ্যাবিকেন আব চিমনী।

এঃ! কিসেব পচা গন্ধ উঠছে। কোথায ইঁদুব পচে পড়ে আছে' দুর্গন্ধ বাবো মাস চব্বিশ ঘন্টা; নর্দমাগুলোই এখানে ছেলেদের পাইখানা।

পিছন থেকে শিস উঠেছে।

পাড়ায কতকগুলো চ্যাংড়া আছে। একেবাবে জানোযাব! আজ তো শুধু শিস। অন্যদিন ছড়া বলে। গান ধবে। তাদেব দবজায খড়ি দিয়ে লেখা থাকে 'ভাল বাসি গো'! প্রথম প্রথম বাগ হত। ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেলত। একবাব সে একটু দূবেব বাড়িব বোযাকে আড্ডাবাজ ছেলেদেব কাছে গিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিল এ সব আপনাদেব কি ব্যবহাব? লজ্জা কবে না? কি ভেবেছেন, বাবা মাবা গেছেন বলে আমাদেব কেউ নেই? আমবা পাড়াব পুবনো বাসিন্দে। আমি তাদেব কাছে যাচ্ছি।

মা চিৎকার করত—পাড়ায় কি মানুষ আছে! সমাজ আছে!

তারা তার পিছনে হো-হো করে হেসেছিল। তখন দাঙ্গার পর বোমা ফাটানোর সময়। একদিন তাদের দরজায় বোমাও ফাটিয়েছিল কেউ। সয়ে যেতে হয়েছে। তবে আগের থেকে এখন অনেক কম। বোমাবাজেরা তখন ঠাণ্ডা মেরে গেছে। এখনও মধ্যে মধ্যে প্রেমপত্র পায়। সে আব চঞ্চল হয় না। প্রথম পড়েই ছিঁড়তে যায়। কিন্তু হাত দুটো সক্রিয় হয় না, একটু ধরে থেকে ভাবে পুলিশের কাছে যাবে। তারপর একটু পর আর একবার পড়ে। এবার হাসি পায়। তারপর আস্তে আস্তে কোনটা ছিঁড়ে দেয় কোনটা নর্দমায় ফেলে দেয়।

বাড়ির দরজায় এসে সে কড়া নাড়লে—মা।

ভিতর থেকে মায়ের বকুনি শুরু হয়ে গেল।---তুই আবার আজ একখানা নতুন কাপড় ভেঙেছিস! কালকের কাপড়খানা বিছানায় বালিশের নিচে পাট করা রয়েছে। এ তোর কি রকম ব্যাভার! ওই তো ছিরি!

সে হাসলে। কি উত্তর দেবে?

—আব ওসব কি বিচ্ছিরি বই পড়িস তুই! তিনটে বোন একটা ছোঁড়াকে নিয়ে সারারাত ধরে টানাটানি---মরণ। বিকেল বেলা। কোমরের ব্যথায় মরি। রান্না চাপাতে পারলুম না। শুয়েই বা করি কি? তোর বালিশের নিচে বই থাকে---নিতে গিয়ে দেখি কাপড়খানা। বইটা নিয়ে পড়ে ঘেন্নায় বাঁচিনে।

—চল। ভেতরে যেতে দাও। হেসেই সে বললে।

—আগে উত্তর দে কথার।

—উত্তর? বই পড়ে বা নিত্য নতুন কাপড় পরে যদি খারাপ হতাম মা—তবে অনেক দিন আগেই হতাম। বয়স আমার চব্বিশ পার হয়ে গেল।

মা সরে দাঁড়াল।

*   *   *

চারদিন পর। চারদিন জানালাটা বন্ধই ছিল। পাঁচদিনের দিন শ্যামলী দেখলে জানালাটা খোলা। যেখান থেকে প্রথম সে দেখতে পেলে সেখানেই সে আপনা-আপনি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বুকটা স্পন্দিত হয়ে উঠল। আনন্দ রায় ফিরে এসেছে।

পুরী চলে গিয়েছিল। সেই যেদিন সে ওঁর চাকরের কাছে ওঁর খোঁজ নিয়েছিল অর্থাৎ ওঁর চোখে আঘাত লাগবার পরের দিন। উনি ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন; সেইদিন রাত্রেই উনি পুরী চলে গিয়েছিলেন।

তার পরের দিন সকালেই সে বাজারে গিয়েছিল। দাদা ফিরে আসে ভোরবেলায় আশার বাড়ি থেকে; এলেই চা দিতে হয়, চা টা খেয়ে দাদাই বাজারে যায়। সেদিন দাদা ফেরেইনি। সে-কথা অবিশ্যি আগের দিন বলেই গিয়েছিল দাদা। আর বলে না গেলেই বা কি হত!

বাজারে দেখা হয়ে গিয়েছিল আনন্দ রায়ের চাকরের সঙ্গে। দু'জনেই কুমড়োর

ফালি কিনছিল। চাকবটি দাঁড়িয়েছিল সামনে। ভিড ছিল। ঠেলে ঢোকা ঠিক ভাল লাগছিল না। পিছনে দাঁড়িযে ভাবছিল, দু'-তিনবাব মৃদুস্ববে সামনেব লোককে বলেছিল—দয়া কবে একটু সববেন ? শুনছেন ?

কিন্তু শোনেনি কেউ। শুনেছিল ওই চাকবটি. সে কথা শুনে পিছন ফিবে তাকে দেখে চিনেই বলেছিল—আপনি কুমডো নিবেন ?

সকৃতজ্ঞ হেসে সে বলেছিল—হ্যাঁ। বড্ড ভিড।

—আমাকে দিন। আমিও কিনব।

পযসা সে দিযেছিল। চাকবটি শুধু কুমডো কিনে দিযে ক্ষান্ত হর্যান, কুমডোব ফালিটা তাব থলেতে ফেলে দিযে বলেছিল—আব কি নিবেন ? ভিড সবখানেই।

শ্যামলীব লজ্জা হযেছিল সামান্য বাজাবেব কথা বলতে। সলজ্জভাবেই বলেছিল—সামান্য বাজাব। একপো বেগুন, একপো আলু, শাক আব একপো ছোট কুচো মাছে— আব খানায। থাক, সে আমি কিনে নিচ্ছি। তুমি বেগুন আব আলুটা কিনে দাও।

পয়সা হাতে দিতে দিতে বলেছিল—তোমাব বাবু কুমডো খান নাকি ?

—বাবু নাই আজ।

—কোথায গেলেন ? নেমন্তন্ন ?

—না। কাল বাত্রে পুবী চলে গেল।

—পুবী ?

—হঁ। সনঝেতে বেবিযে গেল, একঘণ্টা পব ফিবে এল ট্যাক্সিতে —বললে বিছানা বেঁধে দে, পুবী যাচ্ছি। আবও সব বন্ধুলোক গেল।

একটু হেসেছিল শ্যামলী। আর্টিস্ট লোক। বোজগাব ভালই কবেন, যাবেন নাই বা কেন ? জিনিসগুলি কিনে এনে চাকবটি যখন দিলে—তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবেই সে বলেছিল—কি উপকাব যে কবলে তুমি!

—কি কবলাম ?

—অনেক উপকাব কবলে। তোমাব নাম কি ?

—হবি। বাবু বলে হবিযা। একটু হেসে মৃদুস্ববে বললে—মাঝে মাঝে হবিযা বাজা।

—খুব ভালবাসেন বাবু। না ? তুমিও বাসো।

—বাবু যে খুব ভাল লোক।

—বডলোক! ছবি এঁকে অনেক পয়সা পান। না ?

—তা পায। তবে খুব খবচ কবে।

—কেন ? ওঁব স্ত্রী বাবণ কবেন না ?

—বাবু তো বিয়ে কর্বেনি।

—বিযে কবেননি ?

—না। উ আব বিয়া কববেও নাই।

চুপ করে গিয়েছিল শ্যামলী। তাকে চুপ করে থাকতে দেখেই হরিষা বলেছিল—আমি যাই।

—আচ্ছা। তুমি বড় ভাল লোক।

সে হেসে চলে গিয়েছিল। অন্যমনস্কভাবে আরও কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিল শ্যামলী। হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল— সে দাঁড়িয়েই আছে। ব্যস্ত হয়ে সে মাছ কিনতে এগিয়ে গিয়েছিল।

সেদিনই সাড়ে তিনটের সময় হরিষাকে দেখেছিল বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সে হেসে বলেছিল—দাঁড়িয়ে আছ?

— হ্যা আপনি যাচ্ছেন?

তারপর তিনদিন আর দেখা হয়নি। বাজারেও না —বাসার বাইরের বারান্দাতেও হরি দাঁড়িয়েছিল না। আজ হঠাৎ দেখলে, আনন্দ রায়ের শোবার ঘরের জানালা খোলা। সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল আপনা আপনি।

আবার চলতে শুরু করলে। খোঁজ করে যাবে? বলবে, আশ্চর্য মানুষ আপনি? চোখের ওই কাটাকুটো নিয়েই চলে গেলেন? আর কিছু নয়, চোখ জিনিস তো! কিন্তু ?

কিন্তু কি ভাববেন, কি বলবেন?

আবার সে দাড়াল। ছাতাটা একটু উপরে ঠেলে দিয়ে সর্বাগ্র পিছনের দিকে তাকালে। বেশি ভয় তার নিজের পাড়ার পরিচিত লোকদের। নেই কেউ। সামনেও না, পাশে পার্কটাতেও না। সামনে অনেক দূরে দু'জনে আসছে। গ্রীষ্ম এই ক'দিনেই বেশ চড়া হয়ে উঠেছে। রাস্তার পিচ নরম হয়েছে। মাঝে মাঝে চটির তলায় কিছু যেন নরম নরম অনুভব করছে। যাবে? চলতে চলতে তার দ্রুত চলন মন্থর হয়ে এল। কিন্তু বুকটা স্পন্দিত হচ্ছে দ্রুততর তিতে। না যাবে না, থাক! গলাটা তার যেন হঠাৎ শুকিয়ে গেছে।

* * *

আনন্দ রায় ঘরে ইজিচেয়ারটায় শুয়েছিল। ঘরের পাল্লাহীন দেওয়াল-আলমারির বইয়ের মাথায় বসে চড়ুইটা ডাকছে চ্রি রি ক। বেশ একটুক্ষণ ছেদের পর আবার চ্রি রি ক। বইয়ের তাকের মাথায় পা দুটো সম্পূর্ণ ভেঙে একেবারে বুক পেতে বসে আছে। সম্ভবত ওইটেই ওদের শোওয়া। দুপুরে পাখিরাও বিশ্রাম করে। পত্র-পল্লবের মধ্যে এমনি করে বসে নিস্তব্ধ ঝিমিয়ে থাকে। ইনি ঘরটাকে কিংবা আনন্দকে ভালবাসে। এখানে এসে নিরাপদ স্থানটি আবিষ্কার করে জেঁকে বসেছেন। খেয়াল ঠিক নয়, ওরা ঘরের আনাচ কানাচ, দেওয়ালের ফোঁকর-ভেন্টিলেটার, পাড়াগাঁয়ে চালের ছাঁচে, এমন কি ঘরের মধ্যে আলমারির তাকে বইয়ের মাথায় জায়গা বেছেছেন দেখছে আনন্দ।

পুরী থেকে ফিরে ঘরে ঢুকবার সময়ই ওর কথা মনে হয়েছিল প্রথম। চড়ুই

প্রেয়সী আছেন তো! না এই ক'দিনের অদর্শনেই অধিকাংশ সময় জানালা বন্ধ দেখে সরে পড়েছেন! সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে রাস্তায় ওই পুরনো পাড়ার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। কালো মেয়ে! একটু হেসে নিজেই নিজেকে ব্যঙ্গ করছিল—প্রেমে পড়লে যে! পুরীতে এ ক'দিন সমুদ্রতীরে এ নিয়ে অনেক সরস পরিহাস-মুখর ঘণ্টা কেটেছে তাদের। আজও নিজেকে পরিহাস করলে না, এ সময় তাকে কোথায় পাবে?

ঘরে ঢুকে চড়ুইটার কথা জিজ্ঞেস করতে হয়নি। হরিয়া ঘরের জানালাটা খুলে দিতেই মুহূর্তের মধ্যে খোলা জানালাটার মাথায এসে বসে তাকে অভ্যর্থনা করেছে—চিরিক। চিরিক। চিরিক। চিক-চিক-চিক!

আনন্দ বলেছিল—এই যে! এসেছ।

হরিয়া বেডিংটা খুলছিল। সে মনিবের কথায় তার দিকে তাকিয়ে মনিবের দৃষ্টি এবং চড়ুই পাখিটাকে দেখেই বলেছিল—ভারী জ্বালাচ্ছে পাখিটা! খড-কুটো আনছে—

—খড়-কুটো আনছে?

—হ্যাঁ। ফেলে দি রোজ, আবার দেখি আবার এনেছে। ওই আলমারির বইয়ের মাথায় জড়ো করে। আজ সকালেও ফেলে দিয়েছি।

পাখিটা ছোট পাখার ফ্রর‍্র্ শব্দ করে গিয়ে বইয়ের মাথায বসল। একবার ঠোঁট ঠোকরালে। নাচনের মতো বার কয়েক লাফিয়ে লাফিযে চাবপাশ ঘুরে ফ্রর‍্র্ করে বেরিয়ে গেল। আনন্দ হরিয়াকে প্রশ্ন করলে—ঘরে ঢোকে কি করে? জানালা খুলে রাখিস নাকি?

—সকালে একবার খুলি, খানিকক্ষণ খুলে রাখি, আর খুলি একবার সন্ধার সময়। তখন জানালা দিয়ে আসে। আর বন্ধ থাকলে কি হবে ওই যে পিছন দিকের দেওয়ালে ভারার বাঁশের গর্তটা ইপার উপার ফুটা রইছে, পলেস্তারার সময় বন্ধ করেনি—ওই ফাঁক দিয়া ঢুকছে।

ফ্রর‍্র্ শব্দ করে চড়ুইটা ঘরে ঢুকে জানালার মাঝখানের আডার পাটির উপর বসলো। মুখে একটা লম্বা শুকনো ঘাস। তারপর সটান গিযে বসলো আলমারির মাথায়।

—ওই দেখেন—আবার আনিছে। ধ্যাৎ-ধ্যাৎ!

—থাক।

—নোঙরা করেছে।

—করুক।

পাখিটা বইয়ের তাকের মাথায় কুটোটা রেখে ঠোঁট এবং পায়ের নখ দিয়ে কারিগরী করে বিছিয়ে ডেকে উঠল—চি-রি-ক। চি-রি-ক।

তারপর ফ্রর‍্র্ শব্দ তুলে উড়ে গেল। আনন্দ ইজিচেয়ারটায় বসে হেসে একটু একটু দোল খেতে লাগল। ক্যাম্বিসের ডেক চেয়ারটা একটু নতুন ধরনের, রকিং চেয়ারের মতো দোলে।

হরিয়া চলে গেল চা আনতে।

আবার পাখিটা এল, এবারও একটা সরু কাঠি। আবার উড়ে গেল। আবার এল ঘাস নিয়ে। আবার গেল। প্রতিবারই ডেকে কিছু বলে গেল।

হেসে আনন্দ বললে—কি বলছ? ইনকিলাব জিন্দাবাদ! না ভালবাসি তাইতো আসি! তা এস! যখন একদিন তোমাকে নারীমুখ দেখে তুমি নারী বলে টিপে আছড়ে মারতে গিয়ে মারিনি, তারপর দুপুরটা জবরদস্তি করে বন্ধ ঘরে আটকে রেখে কলঙ্কিনী করেছি তখন মানতে হবে তোমার ঘর বাঁধার দাবি।

পাখিটা চ্রিক-চ্রিক-চ্রিক করে ডাকছিল। এবার একটু চুপ করে ওই বইয়ের মাথায় জিরিয়ে নেবার জন্যে বুক পেড়ে বসল। বসে ডাকলে চিনিক চিনিক। শান্ত অথবা ক্লান্ত ডাক। পুরীর কথা মনে পড়ে গেল।

পুরীতে একদিন সমুদ্রের ধারে চড়ুই এবং ওই কালো মেয়ে, ওর নাম দিয়েছে ও কৃষ্ণা, ওদেব গল্প বলেছিল। কৃষ্ণাকে নিয়ে পরিহাস করছিল নীরদ। যশোদাদা বলেছিলেন—দেখ নীরদ তোকে গল্পের প্লট দিচ্ছি—লেখ দেখি, দেখবি ফু দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবি। কিন্তু তুই কি লিখবি?

—বলুন না। নিশ্চয় লিখব মনে লাগলে।

—মনে লাগবে না।

—কি করে জানলেন?

—চীন আসবে যে গল্পে।

আনন্দ বলেছিল—বলুন আমি লিখব। নীরদ না লিখুক।

—পারবি? তুই পেন ইঙ্কে ছবি এঁকে গল্প কর।

—আগে বলুন।

—ধর, চীনে হুকুম হয়েছে চড়ুই বরবাদ। বিলকুল মার ডালো। কেমন? এখন একজন শিল্পীর ঘরে একটা চড়ুই এসে ঢুকেছে। অবিশ্যি আর্টিস্টের অজ্ঞাতসারেই। পাক্কা রাষ্ট্রভক্ত। নীরদের মতো আধা নয়। তারপর সে একদিন দেখতে পেল চড়ুইটাকে। কিন্তু মানুষ তো। রাত্রের অন্ধকারে চড়ুইটাকে মারতে গেল—কিন্তু কি হলো, মারতে পারলে না। কি হলো মানে—দেখতে পেল তার বাসায় দুটি ডিম। সে তখন একটা ছোট্ট খাঁচায়—চড়ুই-এর ডিমসুদ্ধ বাসা তার সঙ্গে চড়ুইটাকে পুরে দিয়ে লুকিয়ে রাখলে। খেতে দিত—জল দিত। কিন্তু ছোট্ট খাঁচাটার একটা কাঠির শলা ছিল পচা। সেটা ভেঙে সে একদিন বেরিয়ে পড়ল। বাইরে পল্টনের লোক মারবার জন্য তাড়া করতেই—ধর এয়ারগান ছুঁড়তে সেটা মিস্ করল। পাখিটা উড়ল। একেবারে তোর চড়ুইয়ের মতোই উড়ে এসে ঘরের জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল। তখন সেপাইরা ঢুকল আর্টিস্টের ঘরে। খুঁজে দেখতে গিয়ে বের করলে খাঁচাটা। খাঁচায় তখন আর একটি চড়ুই নয়—তখন দুটি বাচ্চা হয়েছে। বুঝলি। তার খাঁচা এবং আর্টিস্টকে ধরে নিয়ে গেল। হুকুম হলো আর্টিস্টকে—তুমি মার নিজে হাতে। সে বললে—না পারব না। হুকুম হলো—শূট্ হিম।

নীরদ বলেছিল—এটা কি গল্প হলো ? অ্যামেরিকায় লিখে পাঠাও যশোদাদা—, ইংরেজী ভাল লেখো, ওরা লুফে নেবে এবং মোটা টাকা দেবে।

আনন্দ বলেছে—আমি লিখব বা ছবিতে গল্প বলব। তবে উইথ সাম অল্টারেশন। সেটা হলো—কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্প। গল্পটা বলছে বন্দী আর্টিস্ট—ছেঁড়া কাপড পাতলুন। এ্যাঁ ? এবং শেষটা হচ্ছে—সে যখন না বলছে—তখন হুকুম হলো পাঁচ বছর হার্ড লেবার কন্‌সেন্‌স্ট্রেশন ক্যাম্প।

পুরীর প্রমোদ পর্বটায় কিন্তু এতেই ছেদ পড়ে গেল হঠাৎ। মধ্য রাত্রে দুর্ঘটনায় বাসর ভাঙার মতো। নীরদ ক্রুদ্ধ হয়ে আনন্দকে বললে—দেখ না তোর ওই কৃষ্ণা তোকে নিয়ে কেমন একখানা ঝাড়ি, দেখবি। তোদের এই পচা সমাজ—একেবারে খুলে দেব পর্দা।

সূত্র এ থেকেই।

বাদানুবাদ থেকে শেষ পর্যন্ত আনন্দ একটা ঘুষি মেরেছে নীরদকে। নীরদ রোগা প্যাকাটি কুঁজো।— সামান্য মদ খেলেই কাত হয়ে পড়ে এবং চেঁচায়।

পড়ে পড়েও সে কৃষ্ণাকে গাল দিচ্ছিল পেটি বুর্জোয়া ঘরের হার্লট বলে। গোড়ায় মদের নেশার ঘোরে এবং রসাধিক্যে বলে ফেলেছিল কতকগুলি লোভাতুর কুৎসিৎ কথা। যার মধ্যে খানকি শব্দটাও ব্যবহার করে ফেলেছিল। আনন্দ সহ্য করতে পারেনি। প্রথমে মেরেছিল এক চড। তাতেও থামেনি নীরদ—তখন মেরেছে ঘুষি।

এরপরই পালা ভাঙল।

আনন্দই বললে—আমি আজই চলব যশোদাদা।

যশোদাদাও অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলেছিলেন—সবাই। আজই সন্ধেতে, এক্সপ্রেসে না হয়—প্যাসেঞ্জারে। জগন্নাথ মন্দির একবার যাবি নাকি ?

আনন্দ বলেছিল—না।

আজ ভোরে এসে নেমেছে।

হরিয়া চা নিয়ে এল। আনন্দ একটু পাঁউরুটির টুকরো গুঁড়ো করে বইগুলোর মাথায় ছড়িয়ে দিলে। তারপর খেতে বসল।

চড়ুই ফিরে এসে পাঁউরুটি গুঁড়ো পেয়ে খেয়ে লেজ নাচাতে লাগল। অথবা ঠুকরে খেতে গেলেই ওর লেজ নাচে।

রাত্রে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ঘুম হয়নি। তবুও জানালাটা খুলেই শুয়েছিল আনন্দ। পাখিটা তখনও ঘন ঘন আসছে যাচ্ছে—নীড় নির্মাণে ব্যস্ততার ব্যগ্রতার ওর সীমা নেই। সম্ভবত ডিম পাড়ার সময় খুব কাছে এসেছে। দেওয়ালের ওই ছিদ্রটা দিয়ে কুটো ঘাস মুখে নিয়ে আসায় নিশ্চয় অনেক অসুবিধে।

কিন্তু গরম হাওয়ার জন্য নিজের অসুবিধে কম হয়নি। ঘুমটা ভেঙে গেল পৌনে তিনটেতেই। পাখিটাও বাসায় বুক পেড়ে শুয়ে ঘুম ভেঙে উঠেছে। ডাকছে—মৃদু শান্ত ক্লান্ত বিষণ্ন কণ্ঠে—চিনিক, চিনিক। অনেকক্ষণ বাদে বাদে। কালো মুগদানার

মতো চোখ দুটো কখনও খুলছে আবার বন্ধ করছে। নিদ্রাজড়িমা জড়িত নয়নে চাচ্ছেন শ্রীমতী।

ঘড়ির দিকে তাকালে আনন্দ—দুটো আটচল্লিশ।

আনন্দ পাখিটাকে বললে—কি ? কি বলছ ? তোমার কথা তো অনেক শুনলাম। তার কথা বল কিছু। তুমিই তো দূত ! সে আসছে ! ভালো আছে তো ? কাল এসেছিল ?

চিনিক চিনিক। তারপর ভাঁজা পা সোজা করে উঠে বার দুই গা ঝাড়া দিয়ে সরব বা সহজ চ্রিরিক-চ্রিরিক-চ্রিক—ডাক দিয়ে সোজা টানে ফ্ররর্ শব্দ তুলে জানালা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

আনন্দ উঠে জানালার কাছে দাঁড়াল।

রোদে ঝাঁঝ হয়ে তাপ বেড়ে আজ নিশ্চয় একশোর উপরে। দেবদারুর কচি পাতাগুলো আম্‌লে গেছে। এই ক'দিনের মধ্যে শিমূল জাতীয় গাছগুলোর অনেক ফুল ঝরে গেছে, দু'-চারটে শুকনো-দেখতে ডালের ডগায় কচি পাতা বেরিয়েছে। রাস্তায় কেউ নেই। গরম হাওয়া মুখে লাগছে। ক'দিন পুরীর পর এখানে রোদের উত্তাপ বিশ্রী রকম ঝলসানো মনে হচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকালো সে। দুটো পঞ্চাশ। সে ফিরে এসে আবার চেয়ারে শুলো। চোখ বুঁজলো।

নাঃ। শুয়ে থাকা যায় না। ক'দিনের ছুটির পর আজ কাজের তাড়া ছেলেবেলায় ইস্কুল টাস্কের মতো তাগিদ নিয়ে এসেছে। উঠে সে রঙ তুলি কাগজ নিয়ে বসল—উইলিয়মসের কাজ দিতেই হবে।

চ্রিরিক। চ্রিক। চিরিক। পাখিটা আসছে যাচ্ছে।

টং—টং—টং। চ্রিক। চ্রিক ! আনন্দ সকৌতুকে ঘড়িটার দিকে তাকাল। হেসে উঠল। চড়ুইটা হেরে গেছে, বাজনা শেষ হবার পর গিয়ে বসেছে ব্র্যাকেটে! ডাকছে—চ্রিক চ্রিক-চ্রিক। তাকিয়ে আছে ঘড়িটার দিকে। আর বাজছে না। বেচারা! কয়েক মুহূর্ত ব্যর্থ অপেক্ষা করে সে উড়ে গেল—চিরিক।

আবার একবার উঠল আনন্দ। নাঃ। ওই শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। নাঃ। এই তো তিনটে। সে ফিরে এসে বসল আবার। আঁকতে লাগল।

পাকস্থলীর ছবি আঁকছিল মাল্টিভিটামিনের জন্যে। সেটাকে সরিয়ে দিলে। নতুন কাগজ নিয়ে আঁকতে লাগল। মাদারস টনিক। একটি মেয়ের কোলে একটি ছেলে—স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। সাঁওতাল মেয়ে আঁকবে। কালো মেয়ে—মুখখানা ঠিক কি মনে পড়ছে? যা পড়ছে তাতে তো কালো কুরূপা বলে মনে হচ্ছে না। তাই আঁকবে সে। তুলির টান দিয়ে সে হঠাৎ গুনগুনিয়ে গান ধরে দিলে—'দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ। কালো ? তা সে যতই কালো হোক।'

হঠাৎ বাইরে সশব্দে কিছু পড়ল। চেয়ার একখানা ? কে ফেললে ? বারান্দার দিকের জানালাটা সে খুলে ফেললে। বাইরে এই ঝাঁঝেই দেওয়াল ঘেঁষে হরিয়া ঘুমুচ্ছে। চেয়ারখানা উল্টে গেছে, আর তার পাশেই পা হাত দিয়ে চেপে ধরে নুয়ে পড়েছে কালো মেয়েটি। হাতের ছাতাটা পাশে পড়ে আছে। বেশ লেগেছে তাতে সন্দেহ

নেই। জানালা খোলাব শব্দ পেযে, মুখ তুলে আনন্দকে দেখে তার মুখ হয়ে গেছে ধরা পড়া চোবেব মতো। তবু হাসতে চেষ্টা কবছে।

আনন্দ ব্যস্ত হযেই বললে—লেগেছে খুব? কোথায় লাগল?

সে অপবাধীর মতো বললে—পাযে লেগে চেযাবখানা উল্টে গেল।

আনন্দ বললে—হবিযাটা একটা ইডিযট। এমন সামনে চেযাবগুলো বাখবে! এই হরিযা! এই!

হবিযা উঠে বসল।—অঁ।

আনন্দ ঘুবে সামনেব ঘবেব দবজা খুলে বেবিযে এসে বললে—কোথায লেগেছে?

—হাঁটুতে চেযাবখানাব কোণাটায লেগে গেল। দোষ আমাবই। বলে সে চেযাবখানাকে তুলতে গেল। আনন্দ কেড়ে নিযে নিজে তুলে বললে—এখনও কন কন কবছে?

ম্লান হেসে মেযেটি বললে—কম লেগেছে। বলে সে হাত ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা কবেই একটি ছোট উঃ শব্দ কবে আবাব চেপে ধবলে পা খানা!

আনন্দ বললে—ও লোহাব চেযাবেব কোণ লেগেছে হাঁটুতে। দেখুন তো বিপদ! হাঁটু জাযগাটা ভাবী খাবাপ। ওখানে তো ছোট ছোট হাড থাকে। ভেঙে না গিযে থাকলে হয। হবিযা, তুই চট কবে গিযে খানিকটা বরফ নিযে আয তো। আপনি ভেতবে এসে বসুন।

—থাক, এইখানেই বসছি আমি।

—না না। এখানে বসবেন কি? এই তো সামনে বসবাব ঘব। এখানে কি গবম দেখছেন!

হেসে শ্যামলী বললে—এই গবমে আমাকে বোজ বেরুতে হয, গবমে কষ্ট হয না আমাব।

—হয। আপনাবও হয। সহ্য কবেন। আজ আমাব এখানে এসে হাটুতে লাগালেন, আব বাইবে বসবেন সে হয না। তাছাড়া এখানে বরফ ঘষবেন কি টিপবেন বাস্তায় লোক জমবে। চলুন ভেতবে চলুন।

আব আপত্তি কবলে না। শ্যামলী আস্তে আস্তে খুঁড়িযে পা ফেলে এসে ঘবে ঢুকল। আনন্দ বললে—ধবব?

প্রায যেন আর্তস্ববে শ্যামলী বলে উঠল—না—না—না। দোহাই আপনাব। আনন্দ ধবল না বটে কিন্তু শ্যামলী ঘবে ঢুকবামাত্র ড্রইংরুমে বেতেব সোফাসেটেব একখানা চেযাব ঠেলে এগিযে এনে সামনে ধবে বললে—বসুন। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে আঘাতটি সামান্য হযনি। বসুন।

শ্যামলী তা অনুভব কবছিল। বিনা বাক্যেই সে চেযাবখানায বসতেই আনন্দ বললে—পা দুটো একটু তুলে আলগা কবে বাখুন, আমি টেনে ভিতবে নিচ্ছি। এটা একেবাবে দবজাব সামনে।

শ্যামলী ধীরে ধীবে কেমন হযে যাচ্ছে। এমন সমাদব কেউ তাকে কবে না।

সে সামান্য ক্যানভাসার। সে একটি শ্রীহীন কালো মেয়ে। সে অর্ধশিক্ষিতা নিতান্ত সামান্য ঘরের মেয়ে। এত সমাদর তো কেউ করেনি। তরুণের দল পাড়ায় তাকে ব্যঙ্গ করে, অশ্লীল ইঙ্গিত করে, পাড়ার বাইরে ভদ্রবেশী তরুণ প্রৌঢ়রাও পিছন নেয়—ইঙ্গিত করে। তাতে সে অভ্যস্ত—এতে সে অভ্যস্ত নয়। বড় অস্বস্তিবোধ করছে সে। আবার কি যে ভালো লাগছে। ডান হাতে হাঁটুটা চেপে ধরে সে বসে রইল মাথা হেঁট করে। মাথা সে তুলতে পারছে না আনন্দের চোখে চোখ পড়বে বলে। মধ্যে মধ্যে তার কান্না পাচ্ছে।

আনন্দ একদৃষ্টে তাকিয়েছিল তার চুলের রাশির দিকে। একরাশি রুক্ষ কালো চুল। ফেঁপে ফুলে—তার অবনত দেহখানাকে ঢেকে রেখেছে। ভাল লাগছে। তার জীবনে এ এক নতুন স্বাদ। একটি মেয়েকে এমন কাছে পাওয়া নতুন নয়! কিন্তু এমনভাবে এই করুণা, এই স্নেহের সঙ্গে কাছে পাওয়া নতুন। তার মনের প্যালেটে কালো রং আর সাদা রং যেন মিশে নতুন রঙ হচ্ছে। আকাশের মতো নীল রঙ হয়ে উঠেছে। কখনও বেশি কালো পড়ে কালচে হচ্ছে। কখনও সাদা বেশি এসে তাকে চোখ জুড়ানো নীলাভ করে তুলছে। হঠাৎ একসময় সে তার মাথায় হাত দিল। চমকে উঠল শ্যামলী। আনন্দ বললে - যন্ত্রণা খুব বেশি হচ্ছে?

মাথাটা না-এর ভঙ্গিতে দুলে উঠল।

-- তবে এমন করে বসেছেন? মনে হচ্ছে যেন যন্ত্রণা হচ্ছে সেটা দেখাতে চাচ্ছেন না।

এবার ম্লান হেসে মুখ তুললে শ্যামলী। মনোরম মিথ্যা এমন সুখের আনন্দের পরিবেশে বোধ হয় মন জুড়িয়ে দেয়। যাতে সবটাকে আরও মধুর করে তোলে। এক্ষেত্রে আনন্দের করুণাই শ্যামলীর কাছে সে মাধুরী উৎস- মধু। সে বললে—ভাবছি আজ আর কাজে যেতে পারব না। হয়তো দু'-তিন দিনই আটকে থাকতে হবে। যেখানে কাজ করি সেখানে তারা কি বলবে? ম্লান হাসিটুকু আরও একটু বিষণ্নতায় যেন সন্ধ্যার অন্ধকারের মতো মনে হলো।

- --পা-খানা ধরে একটু টেনে দেব? হয়তো কমে যাবে।

—না—না।

হরিয়া বরফ নিয়ে এল।-- বরফ এনেছি।

আনন্দ বললে—ভেঙে নিয়ে আয়। আর তোয়ালে দে।

শ্যামলী হঠাৎ বলে উঠল— আপনার ঘরখানি এত সুন্দর করে সাজানো।

—ভাল লাগছে?

—খুব। এমন আমি দেখিনি।

—অথচ খুব সহজ। সস্তাও খুব। খরচ বেশি নয় মোটেই। রূপ উপকরণের প্রাচুর্যে নয়, তাকে পরিচ্ছন্নতায় সাজানো। এই যে আজ আপনি পাড়হীন সাদা কাপড়খানি পরেছেন আর জরদা ব্লাউস—এতে যে আপনাকে সুন্দর লাগছে, একখানা বেনারসী পরলেও তা লাগত না। আপনার নিজের তো সে রুচি রয়েছে।

শ্যামলীর মুখখানা কেমন দেখালো সে শ্যামলী জানে না, কিন্তু সারা অন্তর তার শরতের অজস্র সাদা ফুলে ভরা মালতীলতার মতো হয়ে উঠল। একটা মালতীলতার গাছ তাদের বাড়িতে আছে উঠোনের কোণের গাছটাকে জড়িয়ে।

আনন্দের কিন্তু ভারী ভাল লাগলো। মেয়েটির তো আশ্চর্য একটি লুকনো শ্রী আছে। কিছুটা পুষ্টি আর কিছুটা মার্জনা প্রসাধন হলে ও সত্যিই সুন্দর মেয়ে। চোখ দুটি সরু কিন্তু টানা। ভারী সুন্দর। কিন্তু হরিণ চোখ নয। এ চোখ নারীব! হরিণেরও নয় পুরুষেবও নয। খানিকটা লাল রঙ—দেহে রক্ত পুষ্টি—আব খানিকটা নীলাভ সাদা রঙ।

হরিযা একটা গামলায বরফ ভেঙে নিযে এল, তোযালেটা চেযারের হাতায নামিযে দিলে। আনন্দ বললে—ঘরের দরজা বন্ধ করে দে হরিয়া। আমরা বাইবে যাচ্ছি। আপনি বরফটা ওখানে ঘষুন। কেমন? দেখবেন সঙ্গে সঙ্গে কমে যাবে।

আনন্দ নিজের শোবার এবং কাজ কববার ঘবে এসে জানালার ধাবে দাঁড়ালো। মনটা খুশিতে ভরে আছে। বাইবে অপরাহ্ন নামছে। কাক শালিক পথে নেমেছে, আকাশে উড়ছে, ইলেকট্রিক তারে বসেছে। ডাকছে। চড়ুইগুলোব অজস্র কিচকিচিনিতে ভরে দিযেছে আশ-পাশ। তিনি কই? তিনি! দূতী? নাঃ, সে ঘবে নেই। ঢং ঢং করে চারটে বাজল। ঘরের মধ্যে পাখাব শব্দ হলো না, ঘড়ির কাঁচে ছোট ঠোঁটের ঠোক্কর উঠল না, ক্রিরিচ—ক্রিচ-ক্রিচ শব্দ কবে কেউ ডাকল না। সে নেই। আরে আবে এই যে, তার কানেব পাশ দিযে পাখাব ফ্ররর্ শব্দ হলো। তাব সঙ্গে ক্রিরিচ। তার পিছনে আর একটা। গলায কালো ত্রিভুজ। সেটা জানালার ধার পর্যন্ত এসে আনন্দকে দেখে গোঁত্তা খেযে ঘুরল। সামনেব ইলেকট্রিক পোস্টের উপর বসে লেজ নাচিয়ে ডাকতে লাগল। ঘরের মধ্যে দূতী তখন আপন বাসায গিয়ে বসে ডাকছে ক্রিচ-ক্রিচ—। ওর তাড়ায পালিয়ে এসেছে। ওটা পুরুষ।

তাব অন্তব বঙটা কেটে দু'ভাগ হযে যাচ্ছে। তারই মধ্যে সে চিন্তায মগ্ন হযে গেল। কত এলোমেলো চিন্তা কল্পনা। সামনেব বাস্তায তখন লোক চলাচল শুরু হযেছে। কিন্তু সে আনন্দের চোখে পড়ল না। ঘরেব মধ্যে থেকে পাখিটা বেরিয়ে গেল, আবার এল, আবার গেল। সেদিকেও তার মন আকৃষ্ট হলো না। খেলাটা অর্থহীন। না। অর্থ আছে একটা। এই তো জীবনেব স্বরূপ! এর উপব এত নানারকম রং চড়ানোব কিছু মানে আছে? একবার মনে হয, নেই। একবার মনে হয়, আছে। না—নেই। মানুষই চড়িযেছে। মানুষই সেটা ধরে ফেলেছে। তার মনে সাদা কালোয় মিলে যে শূন্য আকাশের নীল অলীক রহস্যের সৃষ্টি করেছিল সেটা কেটে যাচ্ছে।

—হরি! হরি!—ওঘর থেকে মিষ্ট নারী কণ্ঠের সসঙ্কোচ ডাকে আনন্দের চিন্তা ভেঙে গেল। সে এসে ও-ঘরেব ও এ-ঘরের মধ্যের দরজাটায একটু শব্দ করে বললে—ডাকছেন? ভিতরে যাব?

—হ্যাঁ! আমি এইবার যাব।

দরজাটা খুলে আনন্দ ঘরে ঢুকল। বললে—কমল ব্যথা ?

দাঁড়িয়ে ছিল শ্যামলী। হেসে বললে—খুব কমে গেছে। দেখছেন না উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি! দু' পা ফেলে বললে—একটু খোঁড়াতে হচ্ছে কিন্তু চলতে পারব।

—চলতে পারবেন হয়তো, কিন্তু চলবেন না!

—আপনি আমাকে আপনি বলছেন আমার কিন্তু ভারী লজ্জা করছে। আপনি বড়, সবদিক দিয়ে। আপনার মতো ভালো লোক আমি দেখিনি! পরের জন্যে—কে আমি কোথাকার নগণ্য মেয়ে—তাকে যে যত্ন করলেন—

--এই দেখুন! সেদিন আমার চোখে দু'ফোঁটা রক্ত দেখে যে উৎকণ্ঠা আর মমতার সঙ্গে কথা বলেছিলেন—এ তার থেকে বেশি নয়।

—কি বলছেন! কি করেছিলাম আমি ?

—সুযোগ পেলে হয়তো করতেন।

—তা কবতাম। এবং নিজেকে ধন্য মানতাম। আপনি একজন শিল্পী। কত বড মানুষ!

--কত বড মানুষ! সেও মেপে ফেলেছেন ?

—ফেলিনি ? ও মাপ কি লুকোয ? হাতের চড়ুই পাখিটা ? একটা চড়ুইয়ের ওপর এত করুণা। আমি দেখিনি শুনিনি।

হেসে আনন্দ বললে—সে আমার ঘরেই বাসা বেঁধেছে। দেওয়াল আলমারির পাল্লা নেই, বইয়ের থাকের উপর সে খড়কুটো এনে দিব্যি গেড়ে বসেছে।

— সত্যি ?

—দেখবেন ?

—না। দেখবে বললে তবে দেখব।

—আচ্ছা এস, দেখ। সে হয়তো ঘরেই রয়েছে।

চড়ুইটা ঘরে ছিল না। আনন্দ দেখালে—ওই দেখে বইয়ের মাথায় খড-কুটোর গাদা।

—তাই তো।

চড়ুইটা কুটো মুখে এনে তাদেব পাশ দিয়ে পাখার শব্দ করে উড়ে গিয়ে বাসায় বসল। শ্যামলী বললে--ও মা! তারপর বললে—যে সুন্দর সাজানো ঘর, আর ঘরের মালিকের যে দয়া তাতে ও লোভ সামলাতে পারেনি।

যাবার সময় আনন্দ বললে--আজ থেকে আমরা কিন্তু বন্ধু।

—বন্ধু! আবার তেমনি শ্রী ফুটে উঠল তার মুখে। আপনি বন্ধু, আমার ?

—বাধা কি ? আপনার খারাপ লাগে ?

—না।

—তবে ?

মুখখানা এবার একটু নত হয়ে পড়ল। হাসলে। ম্লান হাসি। বললে—এখানকার লোকদের আপনি জানেন না। তারা—

—লোকের কথা সবখানে সমান। এখান-সেখান নেই। কিন্তু তা নিয়ে আমাদের কি? ও গ্রাহ্য করলে জীবনে শুধু না-পাওয়ার দুঃখই বোঝা হয়।

—তা বটে, তবে, বন্ধুত্ব হোক, জমুক তারপর হবে।

—আচ্ছা,—একটু হাসলে আনন্দ তারপর বললে—এবার আপনার নামটি বলুন।

—আমাকে আপনি নাই বললেন।

আনন্দও বললে এবার—বলব, বন্ধুত্ব হোক আগে। আপনার—একটা নাম আমার দেওয়া আছে। মাস দেড়েকের মধ্যে যেদিন বাড়িতে থেকেছি সেইদিনই আপনাকে ছাতায় মুখ ঢেকে যেতে দেখেছি। ছাতা দেখেই চিনতে পারি। চলার মধ্যেও একটা ছন্দ আছে। তার থেকেও আপনার চুলের শোভা দেখে মনে মনে তারিফ করি।

লজ্জায় আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল শ্যামলী। এমন সব কথা শোনবার ভাগ্য তার হবে এ তার কল্পনারও অতীত। সে যেন ভিতরে ভিতরে থর-থর করে কাঁপছে, স্পর্শাতুর লজ্জাবতী লতার মতো সব স্নায়ুগুলি নুয়ে পড়ছে। সে বললে—আমার নাম শ্যামলী।

আনন্দ বলতে গেল—আমি রেখেছিলাম সুকৃষ্ণা। কিন্তু বলতে গিয়েও বললে না। বললে—আমি রেখেছিলাম কাজল। ও নামটা আমার ভারী মিষ্টি লাগে।

শ্যামলী আর একটু হেসে কোন কথা না বলে চলে গেল। সত্যিই কাজল নামটি ভারী মিষ্টি।

আনন্দ দাঁড়িয়ে রইল। শ্যামলী একটু খুঁড়িয়ে চলছে। বেচারা কালো মেয়ে! আনন্দের সমস্ত অন্তরটা একটি আনন্দে ভরে উঠেছে। উল্লাস—পরিচ্ছন্ন উল্লাস। পুরীর ঘটনার পর ওর মন আজ অত্যন্ত সংযত।

সেই উল্লাসে সে এ-ঘরে এল। চড়ুই দূতীকে বলবে—তোমার দৌত্যের অপমান করিনি সখী। চড়ুই নেই। বাইরে কোথায় নেচে নেচে উড়ে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ বাইরে বেড়াবার জন্যে সে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠল। আজ সে যথেষ্ট পরিমাণে পান করবে। টাকা আছে। পুরী যাওয়ার সময় চেক দিয়ে যশোদাদার কাছে টাকা নিয়েছিল। বাবে যাবে।

কিন্তু হলো না। বেরুবার আগেই ঝড় এল। প্রবল ঝড়। সে সেজে বেরুতে যাচ্ছিল। আকাশের অবস্থা দেখে দাঁড়াল। ঝড় তখন দূরে উঠেছে—হু-হু করে আসছে। সে বসল বাইরে চেয়ারখানায়। পার্কের দেবদারু গাছের মাথাগুলো পুবমুখো হয়ে নুয়ে পড়ল। ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেল চারিদিক। হরিয়া ছুটল জানালা বন্ধ করতে। হঠাৎ আনন্দ উঠল এবং ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বললে—দাঁড়া-দাঁড়া। সে ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে তাকালে আলমারির দিকে। ওই যে। চড়ুইটা বুক পেড়ে নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে জুলজুল করে তাকাচ্ছে। আলোর ছটা পেয়ে সেটা এবার ডেকে উঠল—সেই মৃদু স্বরের মিহি শব্দ—চিনিক্-চিনিক্।

আনন্দ নিশ্চিন্ত হয়ে এসে বাইরে বসল। ঝড় দেখতে বসল। একটু পরে বৃষ্টি এল। বেশ খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেল। হরিয়া বললে—বাইরে বেরুবে না?

—না। বৃষ্টির জলে ভিজে পিচের পথের উপর ওপারের রাস্তাটায় বাস কার চলেছে ঝাঁকে ঝাঁকে। সামনের হেডলাইটগুলি জ্বলছে—নীচে ভিজে পিচের উপর তার প্রতিবিম্বও চলছে—দুটো আলো চারটে হয়েছে। পার্কের মধ্যে জমা জলে ছটা পড়ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একসময় সে চঞ্চল হয়ে উঠে ভাবলে—বেরুব। উৎসাহ সংগ্রহের জন্যে ব্রণমুখী ফিরিঙ্গী মেয়েটা কোন বার-টেবিলে বসে সিগারেট খাচ্ছে কল্পনা করতে চেষ্টা করলে। আবছা ঝাপসা ছবি উঠে উঠে মিলিযে গেল। শ্যামলীকে মনে পড়তে লাগল। কল্পনা করলে শ্যামলীর সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে জেটীর উপর রেস্তোরাঁয় বসে গল্প করছে। শ্যামলীব মুখে পুষ্টির রক্তাভা, মার্জনা, প্রসাধনের শুভ্রতা। তার পরনে কি রঙের কাপড? ফিকে জবদা ব্লাউস—গাঢ লাল কি ফিকে নীল। না! ফিকে নীলাভ শুভ্র পাড়হীন শাড়ি-ব্লাউস, গাঢ় হলদে সোনার মতো নয়তো জরদা বঙের। শ্যামলীব সিঁথিতে কি— ? না, সুপ্রচুর ফাঁপানো রুক্ষ চুলের মাঝখানে সাদা টোযাইন সুতোর মতো সিঁথি— সেখানে কোন দাগ নেই। বন্ধু এবং বান্ধবী। পার্কের ওপাশের রাস্তাটাব বাঁকে কযেকখানা কার বা ট্যাক্সি উত্তরমুখে ঢুকে বাঁয়ে বেঁকে পশ্চিমমুখী হচ্ছে। দুটি কবে আলো, ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল আলো। পরেব পর। পরের পর। রাস্তার জল শুকিযেছে। তবু পিচের উপব আভা পড়ছে লম্বা হযে। পার্কের ভিতরে ভিজে ঘাসে জমা আলোগুলো জেগে উঠে মিলিযে যাচ্ছে। হঠাৎ একসময় মনে হলো—না। এ ভালো লাগছে না।—ওবে হরিয়া। তুই যা একবার, রিক্‌সা ট্যাক্সি যা পাস নিযে আয়। শ্যামলী কাজল থাক, সে আনন্দ উল্লাস কিন্তু বার ভিন্ন হয় না। বৃষ্টিতে বারের আসব জমে ভাল।

দুই

সেদিনও বৃষ্টি হয়েছিল। চার মাস পর। বর্ষার বর্ষণ। তবে কলকাতার রাস্তা জলে ডুবে দুর্গম দুস্তর পারাবার হযে ওঠেনি। আকাশে কিন্তু মেঘ এসেছে সেজেগুজে। নিবিড় কালো মেঘ। আনন্দ ট্যাক্সি করেই ফিরল। রাত্রি তখন এগারটা বেজে গেছে। গাড়িটা পার্কের পুব মাথায ঢুকে পশ্চিম দিকে ধনুকের ভিতর দিকের বাঁকের মতো রাস্তাটার মোড় নিচ্ছিল, আনন্দ বললে—নেহি সর্দারজী, ডাহিনাসে সিধা চলিয়ে।

আনন্দের কণ্ঠস্বর জড়িত। মদ খেয়েছে।

কিছুদূর উত্তরমুখে এসে বাঁযে পশ্চিমমুখী রাস্তা ধরে বাসায় উঠবে। মোড়টায় এসে সে বললে—রোখিয়ে তো।

—হিঁয়েই উতরেঙ্গে সাব?

নামতে গিযে আনন্দ অনুভব করলে পায়ে জোর কম হযে পড়েছে। মদ বেশি খেয়েছে। শুধু তাই নয়, মদ বেশ কিছুদিন পর খেয়েছে। কিছুদিন মদ সে খায়নি। অনেকদিন পর কতটায় ঠিক থাকতে পারবে তা ঠিক বুঝতে পারেনি। এবং মেজাজে সে ক্ষুব্ধ ছিল, নিষ্ফল ক্ষোভ। রাগ হয়েছিল নিজের উপর। শ্যামলী! শ্যামলী তাকে

অপমান করেছে, তাকে ফেলে তার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে, নিষ্ঠুর কথা বলেছে। অপমানের এবং ব্যর্থতার ক্ষোভে সে একটা বারে বসে মদ খেয়েছে।

এই কয়েক মাসের মধ্যে জীবনের স্বাভাবিক গতিতে তারা অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়েছিল। সেই যেদিন শ্যামলীর পায়ে আঘাত লাগে তার পরদিন তার অনেক কাজ ছিল, বেরুনো উচিত ছিল বারোটার মধ্যে। বেরোয়নি। চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। কালো মেয়ে কাজল—সে নাম দিয়েছে—তাব সঙ্গে বন্ধুত্ব স্বীকার করেছে। না, বন্ধুত্বের চেয়েও কিছু বেশি তার তলায় ছিল। জোড কলমের মতো। সনাতনই বল আর আদিমই বল একটি নারী এবং একটি পুরুষের মধ্যে চোখাচোখি হলে বিদ্যুতের গতিতে যে একটি অদৃশ্য শিহ্বন বযে যায পবস্পরের, অঙ্গের দিকে মনের দিকে চুম্বকের লোহা আকর্ষণের মতো সেই আসল গাছের মাথাটা কেটে স্নেহ মমতা শ্রদ্ধা বন্ধুত্ব যে কোন একটাব ডাল কেটে বাঁধা হয। কোন ঝডে ওই জোড ভেঙে জোডা দেওযা ডালটা যখন ভাঙে তখন আসল গাছটা ডাল মেলে গজায। ও গাছটা অক্ষয়বটের মতো, দূর্বাঘাসের মতো। ওর মৃত্যু নেই। জীবনই ওর শেকড। ওটা ছিল, অন্যে অস্বীকাব করে করুক, আনন্দ অস্বীকাব করে না। সে নতুন কালেব নতুন মানুষ, সে পুবনো কালের সব সংস্কারকে কাটিযেছে। সে ইস্কাপনকে ইস্কাপন বলে। তবে হ্যাঁ, সে মানুষ। মানুষ মানুষীকে যেকালে বলপ্রযোগে অপহরণ করত সে কালকে অনেক পিছনে রেখে এসেছে। সে জয করে তাব মনকে আগে, মন দিতে এলে দেহ দিতে হয়। এখানে পাখি আর খাঁচা, ভ্রমরা আর সোনার কৌটো পৃথক নয। খাঁচা খুললে কৌটো খুললেও ওরা উডে পালায় না। সেদিন তাব করুণা সত্য, অকপটরূপে সত্য, তাকে যে কলুষিত বলবে সে ভ্রান্ত, তাকে যত্ন করাব মধ্যে তার শিক্ষা সত্য স্বভাবও সভ্য। একজন পুরুষ কেউ এমনভাবে হাঁটুতে লাগালে এমনিই যত্ন করত। তবে হ্যাঁ, সে মানুষী নাবী বলেই তাকে করুণা করে তাকে যত্ন করে অনেক বেশি খুশি—না শব্দটা খুশি নয—পুলকিত হয়েছিল। আগ্রহ অবশ্যই অনেক বেশি দেখিযেছিল। তাকে ভাল লেগেছিল, কালো মেয়েটির মধ্যে সে রূপ আবিষ্কার করেছিল শিল্পীর চোখে। এবং তার রুচি-পছন্দে সে রূপ ভাল লেগেছিল। তার সঙ্গে কথা বলে আরও খুশি হযেছিল। ওর কথার মধ্যে তার প্রতি গাঢ প্রশংসার মুগ্ধতা, তার নম্রতা, সব থেকে বেশি তার সরল মিষ্টতা, না তারও থেকে বেশি কিছু যেন—হয়তো তাব নাম অনুরাগ এবং নিজের বিনীত রূপ-গুণের দারিদ্র্যবোধ আনন্দের আরও ভাল লেগেছিল। স্পর্শকাতর লজ্জাবতীর মতো নমনীয় ভঙ্গিগুলি। এ কার না ভাল লাগে? মেয়েটি সেদিন চলে গেল, বাডি ফিরে গেল; তারপর সারা বিকেল সে তার ভাবনা ভেবেছিল। তার মনে রঙের স্পর্শ লেগেছিল। কাজ না থাকলে বা কোন কাজের আগে রঙ তুলি নিযে সে কাগজে দাগের পর দাগ টেনে চলে, এ বঙ ও রঙ সে রঙ। সূর্যোদয় সূর্যাস্তের সময় কেউ যেমন আকাশে

তুলির দাগের উপর তুলির দাগ টানে, রঙ বদলায়, তেমনিভাবেই মনের আকাশে সে নানান রঙের দাগ টেনেছিল।

মেয়েটির সঙ্গে বন্ধুত্ব গাঢ় করেছিল আপন কল্পনার মধ্যে।

যেন সে পথে যেতে যেতে দাঁড়িয়েছে তার জানালার সামনে—কি করছেন? আজ বাইরে বেরুননি? শরীর ভাল আছে তো? না, কাজ করছেন? ছবি আঁকছেন? কি ছবি আঁকছেন? সে বলেছে—আপনি কাল পায়ে লাগিয়ে গেলেন তাই দাঁড়িয়ে আছি, পথের দিকে চেয়ে রয়েছি, দেখছি আপনি বেরুতে পারলেন কিনা।

—তাই নাকি! না না। আমি ভাল আছি। এই তো কাজে বেরিয়েছি। একটু কন্‌কন্ করছে। কাল এখান থেকে গিয়ে আরও অনেকক্ষণ বরফ ঘষেছি। মা রেগে খুন। বললে—সেঁক দে। আমি শুনিনি। এখানে উপকার যা পেয়েছিলাম।

—দাঁড়ান না, তা হলে আমিও বের হই। একসঙ্গে যাই। আসুন না একটু বসুন, আমি তৈরী হয়ে নিই। চা-টাও খেয়েনি। হরিয়া দরজা খুলে দে। আর চা কর।

হরিয়া দরজা খুলে দিল। সে একটু ইতস্তত করেই এল ভেতরে।

ঢুকে বললে—যে সুন্দর সাজানো ঘর আপনার। আপনিই মন টানে। আচ্ছা ছবিগুলি তো সব আপনার?

—অধিকাংশই। দু'-একখানা বন্ধুবান্ধবের আছে।

—এখানা?

—ওখানা আমার।

—কি সুন্দর!

—দেখুন, সবগুলি—এঘর ওঘরে। বলুন সব থেকে কোন্‌খানা ভাল। আমি মুখ-হাত ধুয়ে পোশাক পরেনি।

আনন্দ পোশাক বাছাই করে। বেছে বেছে সাদা সিল্কের হাফ-শার্ট আর গাঢ় নীলচে ডেক্রনের প্যান্ট নিয়ে বাথরুমে চলে গেল।

ঘরে চড়ুই পাখি বাসায় বসে আছে, এখনও তার দিনের বিশ্রামের জড়তা ভাঙেনি। মৃদুস্বরে থেমে থেমে ডাকছে—চিনিক! চিনিক! আনন্দ তখন এমনই মগ্ন যে কৌতুকবশে সে ডাকের কোন ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেনি। বাথরুম থেকে পোশাক পালটে ফিরে দেখলে কাজল, হ্যা সেদিন সে কাজলই বলেছিল মনে মনে; কাজল তখন তার শোবার ঘরে বর্ষার ছবির দিকে তাকিয়ে আছে, একদৃষ্টে দেখছে। আনন্দ একসময় ষড়ঋতুর ছবি এঁকেছিল দু'খানা। ছবিখানা সত্যিই ভাল হয়েছে। কালো একটি মেয়ে মাথায় জলের ঘড়া নিয়ে আকাশ থেকে মাটিতে নামছে। তার রাশি রাশি সুদীর্ঘ চুল, মেয়েটি দীর্ঘাঙ্গীও বটে। চোখদুটি লম্বা টানা। সম্ভবত কাজল ওর সঙ্গে নিজের মিল দেখতে পেয়েছে। মিল সত্যই নেই—অথচ একটা মিল আছে?

সে হেসে বললে—কি দেখছেন! আপনার সঙ্গে মিল আছে, না?

লজ্জাবতীর মতো নম্রতার আবেশ লাগল ওর সর্বাঙ্গে, বললে—আমার সঙ্গে? আমি এমনই সুন্দর? ছবিখানি কিন্তু সত্যিই সুন্দর।

—একখানা এঁকে আপনাকে দেব। শুধু দিন দুই ঘণ্টাখানেক করে আমার সামনে সিটিং দিতে হবে।

—কি করব নিয়ে?

— ঘর সাজাবেন।

---ঘর? সে ঘর আপনি দেখেননি।

—ঘব যেমনই হোক। সাজালেই সেজে ওঠে। আচ্ছা আমি নিজে সাজিযে দিযে আসব।

—ওরে মা! আমার জননীকে আপনি জানেন না।

হরিযা চা দিযে যায। চা-বিস্কুট। অনেক অনুবোধে একখানা বিস্কুট তুলে নিযে মুখ ফিরিয়ে খায কাজল, তারপর বেরিয়ে যায।

এমনি কল্পনা সে করেছিল। মিলেও গিযেছিল। এই কল্পনাব পর প্রায কয়েক দিনের মধ্যে বাস্তবে তাই ঘটে গিয়েছিল ঠিক ঠিক। অমিল শুধু তারিখের। ঠিক পরদিন, অর্থাৎ আঘাত লাগাব পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা কবেও দীর্ঘাঙ্গী ছত্রধারিণীকে দেখতে পায়নি। সেদিন ওর ইচ্ছে হয়েছিল, খোজ নিতে, ওপাডাব দিকে ঘুবেও এসেছিল কিন্তু কারুব কাছে ওর বাডি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেনি। সঙ্কোচ যা আনন্দের প্রকৃতিতে নেই, সেটা যে সেদিন কোথা থেকে এসেছিল তা সে বুঝতে পারেনি। সেদিন সন্ধ্যাতে বেরিযেও বারে গিয়ে মদ খায়নি। যশোদাদা প্রশ্ন করেছিলেন—কি হলো রে? এ্যা?

—কিছু না। শরীবটা ভাল নেই।

সে—মানে লেখক বন্ধু, যাব সঙ্গে পুরীতে ঝগডা হযেছিল- -নেশাব মধ্যে ওর নামটা কিছুতেই মনে পডছে না। লোকটাকে আদৌ পছন্দ করে না আনন্দ। সেই বন্ধুটি বলেছিল—মন?

উত্তর দেয়নি আনন্দ। যশোদাদা ওদের মিটমাট অবশ্য কবিযে দিয়েছিলেন, মিটমাট করে সে কিছুক্ষণ পরই উঠে চলে এসেছিল। সেদিনও ট্যাক্সি করে ফিরেছিল। এই মোডেই গাডি দাঁড করিযে ভেবেছিল, কিসের সঙ্কোচ? যাবে সে। কিন্তু পারেনি।

পবের দিন সে গিয়েছিল' ওব মা বিস্মিত হয়েছিল। আপনি কি করে চিনলেন শ্যামলীকে? বলেছিল—আমি ওঁদের আপিসের কতকগুলো সাবানের নমুনা দেখতে চেয়েছিলাম। ওরা আমার কাছে ওঁকে পাঠিয়েছিলেন। হঠাৎ চেয়ারের কোণে ধাক্কা লাগল হাঁটুতে। আমি ডাক্তার দেখাতে বলেছিলাম। পাডাতে থাকি, আমার বাড়িতে লাগালেন—তাই খোঁজ করতে এসেছি।

শ্যামলী, না, কাজল তখন বাজারে গিয়েছিল। দেখা হয়নি, ফিরে এসেছিল। বাজারে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল কিন্তু সেটা পারেনি। আবার কেমন সঙ্কোচ হয়েছিল। এত লোকের সামনে! বলে এসেছিল—বলবেন ওঁকে, আমি খোঁজ করে গেছি। সকালে ন'টাতেই সে বেরিয়েছিল। উইলিয়াম্‌সের সাহেব খুশি হয়েছিলেন তার কাজে। তার আগের রাত্রে বার থেকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে প্রায় সারা রাত্রি কাজ করে কাজ

প্রায় শেষ কবেছিল। পেমেন্ট পেয়েছিল। ফিবেছিল বেলা একটায। স্নান কবে খেয়ে উঠে সে ঘুমোয়নি। জানালার ধাবে দাঁড়িয়েছিল। অনুমান কবেছিল আজ সকালে যখন বাজারে যেতে পেরেছে তখন নিশ্চয কাজে বেরুবে।

রৌদ্র প্রখবতব হয়ে উঠেছে। পথ জনহীন, সামনের পার্কে একদল হিন্দুস্থানী আজ পিক্‌নিক্ করতে এসেছে। ওপাবে বাস কার লরী চলছে। গাছেব পাতাগুলি ম্লান কিন্তু ঝকমক করছে বৌদ্রেব ছটায। পাখিবা স্তব্ধ। তাব ঘবেব মধ্যে চড়ুইটা নিস্তব্ধ হযে শুযে বযেছে। চোখ দুটি বন্ধ।

সে হঠাৎ তাব কাছে গিযে দাঁড়িযে বলেছিল – কি গো ? বলতে পাব -আসবে ?

পাখিটা চমকে উঠে গা ঝাড়া দিযে খাড়া হযে উঠেছিল।

চমকে উঠলে যে ? সংবাদ দাও।

পাখিটা আবও চকিত হযে লম্বা চি চিক শব্দ কবে বেরিযে পালিয়েছিল। কিন্তু আবাব মিনিট দুই তিনেব মধ্যে ফিবে বাসায বসেছিল। আনন্দ আব ওকে নিযে কৌতুক কবেনি। থাক– নিবীহ কৃষ্ণেব জীব। থাক।

এব কিছুক্ষণ পবেই দেখা গিযেছিল ছোট্ট লেডিজ ছাতা। আজ কিন্তু চলনটা ঠিক তেমন দ্রুত নয। তাবপব যা সে কল্পনা কবেছিল তাই। না– যা ঘটেছিল তাই মনে পডেছে, মনে হচ্ছে এমনি কল্পনাই কবেছিল।

সেদিন একসঙ্গেই দু'জনে বেবিযেছিল। একসঙ্গে চলাব শুরু। মনে পড়ছে চলাব সময দু'জনেই চলেনি—আবও দু'জন চলেছিল। অপবাহ্ন বেলা, পশ্চিম মুখে চলেছিল তাবা দু'জনে– –আব দু'জন পিছনে আসছিল। কথা বলছিল কাজল, সে শুনেছিল। ওই তাব মাযেব কথা থেকে শুরু কবে তাব জীবনেব সব কথা-- বেদনাব কথাই বেশি। তাই বলে সাধাবণ মানুষ, সংসাবে এত দুঃখ আমাব, তুমি আমাকে দুঃখ দিযো না, করুণাব আববণ দিযে ভালবাসা দাও। এইটেই সব নয, কথাব সঙ্গে সুখেব কথাও বলেছিল দুটো-একটা। ওদেব ভাঙা বাডিব ছাদে কটি টবেব ফুলগাছেব কথা, আব পাশেব বাডিব মালতীলতাটাব কথা ; যাব শিকড় মাল্লিকেব বাড়িতে কিন্তু লতাটা এসে উঠেছে তাদেব বাডিব উঠানেব গাছটায এবং সব ফুলগুলিই ফোটায, সব শোভা সব গন্ধ ঢালে তাদেব বাডিতে। বলেছিল পুবনো আমলেব বাডি দু'জনদেবই। উঠানেব মাঝখানে পাঁচিল আব আমাদেব বাডিটাই পুবদিকে। ওবা টেনে ছাডিযে নিযে নিজেদেব বাডিতে নেবাব চেষ্টা কবে, কিন্তু লতাটা পুবদিকেব গাছটাব টান ছাডতে পাবে না।

পরের দিনই কিছু বেল ফুল এনেছিল সে। ভিজে রুমালে খুব আলতো করে বেঁধে কাপডেব আঁচলে ঢেকে এনেছিল। বাডিব দোরে দাঁড়িযে ডেকেছিল, হবি! হরি! সেদিনও আনন্দ বাডিতে ছিল। কিন্তু ঘুমিয়েছিল। ঘুম ভাঙেনি। পার্কের দিকের জানালাটা বন্ধ ছিল। শ্যামলী ভেবেছিল আনন্দ বাডি নেই। কিন্তু ডাক শুনবামাত্র আনন্দের পাতলা হযে আসা ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। হরিয়াব ঘুম ভাঙবার আগেই

সে ধড়মড় করে উঠে বসবার ঘরের দরজা খুলে সামনের দরজাটা খুলে দিয়েছিল। আসুন।

মুহূর্তের মধ্যে চড়ুইটা পাখায় ফ্ররর্ শব্দ করে বেরিয়ে গিয়েছিল ওই দরজা দিয়েই। বেচারার বের হবার সময় হয়ে গেছে তবু জানালা খোলা পায়নি। এই ঘরের দরজা খোলার সঙ্গে আলোর ঝলকের ইশারা অনুসরণ করে বেরিযে বাঁচল! কাজল বলেছিল—আপনার জন্যে আমার গাছের—ওমা সেই চড়ুইটা বুঝি ? ঘরে বন্ধ ছিল ?

হেসে দুঃসাহসী আনন্দ বলেছিল—আপনার সাড়া পেয়ে লজ্জায় ছুটে পালাল। বেচারা ধরা পড়ে গেছে। আরও বলবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বলেনি। বলা উচিত হবে না বলেই বলেনি। কাজল ঠিক ধবতে পারেনি ইঙ্গিতটুকু। সে নিজের অসমাপ্ত কথাটাই শেষ করেছিল। কাল আমাব টবের গাছের কথা বলেছিলাম, খুব সুন্দর মতিযা বেল। ভোববেলা উঠে তুলে একটা বাটিতে একটু জল দিয়ে ভিজিয়ে ধামা চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। মা তো একটি ফুল তুলতে দেয না, নিজে চান করে ফুলগুলি তুলে দেয। সব পুজোতে। বলি—বেশ, দেবতাকে দিলে বেশ করলে, এখন আশীর্বাদী হিসেবেও দাও, বিছানাব মাথায—প্লেটে বেখে দি। তাও না। সন্ধ্যাব সময় সব গুটিয়ে উঠোনের এক জাযগায় একটা গর্ত মতো আছে, তার মধ্যে ফেলে দেবে।

সত্যই মতিয়া বেলগুলি সুন্দর। যেমন বড় নিটোল গডন তেমনি রঙ তেমনি গন্ধ।

আনন্দেব ইচ্ছে হযেছিল বলে—তুমি তো মালা গাঁথার কল্পনা কর না—গাঁথো না, তাহলে মায়ের দেবতার দাবি মানতে না। গাঁথো না! কিন্তু বলেনি।

* * *

হঠাৎ আনন্দের জীবনে যেন একটা নতুন খেলা শুরু হয়ে গেল। মেয়েটি আসে—কথা বলে, ফুল দিযে যায। আনন্দ ওকে বলে—কই ছবি আঁকবার সিটিং কবে দেবেন ?

মেয়েটি হাসে। বলে, খেপেছেন আপনি!

—কেন ?

মেয়েটি বলে—জানি না। আমি পালালাম।

আনন্দ ওর সঙ্গ নেয। শ্যামবাজার পর্যন্ত এক বাসে যায়, তারপর ফিরে আসে।

বেশ লাগে—খেলার মতো—!

হ্যাঁ খেলাই। এ খেলা তার ভাল লেগেছিল। ভাল লেগেছিল বলেই সে সন্ধ্যায় আর বারে যাচ্ছে না। ব্রণমুখী ফিরিঙ্গিনীকে উইলিয়ামস কোম্পানির আপিসে যাবার পথে অনেকদিন দেখেছে, তার দিকে তাকিয়ে দেখেছেও, কিন্তু সে তাকে টানতে পারেনি। তার রূপ আনন্দের চোখে ঠেকে না তা নয়। নিশ্চয় ঠেকে, ভাল লাগে। একসময় তার মনের কল্পনা ছিল সে যদি জীবনে বান্ধবী পাতায় তবে এই ফিরিঙ্গী মেয়েকেই বান্ধবী করবে। ওদের মধ্যে দুটো রূপ আছে—পূর্ব-পশ্চিম দুই। ওরা

জীবনের খেলাকে খেলা বলে নিতেও জানে। সে খেলোয়াড়ী মন ওদের আছে। কিন্তু তার মধ্যেও ওদের পাওনার হিসেবটা বড়। এবং খেলাটাকে এমন হিসেবের ব্যাপার করে তোলে যে মন তৃপ্তি পায় না। এই কালো মেয়েকেও সে দিয়েছে অনেক। এই ক'মাসে অনেক জিনিস দিয়েছে। তা সে খুশি হয়ে নিয়েছে। কিন্তু টাকা সেও দেয়নি, এও চাযনি। কিন্তু খেলাও তো দু'জনে হয় না। দু'জনে খেলতে গেলেই চারজন হয়। দিনের বেলা তো হযই। রোদ পূর্বদিকে থাকলে অন্য দু'জন পশ্চিমদিকে, পশ্চিমদিকে থাকলে পূর্বদিকে, দুপুরবেলা হলে পায়ের তলায় চারজন তাদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খেলে যায়।

মন দিয়ে দেখলে সে বড মজার খেলা। বসে আছ দু'জনে—বেশ ব্যবধান রেখে, অথচ অন্তরে ইচ্ছে হচ্ছে আরও কাছাকাছি বসি—তখন হয়তো দেখবে ছায়া দুটো প্রায গাযে গায়ে মিশে গেছে। তোমার হাত এদিকে—ওর হাতও এদিকে বেশ কিছুটা দূরে—সূর্য্য আকাশে তেরচাভাবে আলো ফেলে হাতেব উপব হাতখানি রাখিয়ে দিযেছে—কিংবা জডিযে দিয়েছে। সে নিজে শিল্পী এবং তার মন অত্যন্ত সচেতন বলেই এ ছাযার খেলা তার চোখে পড়েছে। শুধু তাই নয তার মনেও ঠিক সে এইভাবে কাযা আর ছাযার খেলা খেলে যাচ্ছিল। যুবক সে—এ যুগের যুবক—তার যৌবন অর্থ দিযে যৌবন ভোগের ব্যাপারে দোষ দেখে না।— সে কালেও যারা দোষ দেখত—নানা বিধিনিষেধের মুখে মানত, তারাই কাজে তাকে লঙ্ঘন করে—গোপনে আডালে বীভৎস ব্যভিচার করত এবং পবের দিন ভাল ভাল কথা বলত এমন কি গঙ্গাস্নান করত। তা সে নয়; তার সব প্রকাশ্য, সে ধার কিছুব ধারে না—শুধু আইনগত বাধা এডিয়ে চলে; এই বিকিকিনির খেলা সে বেশ কিছু দিনই খেলেছে; তার জন্য গ্লানি বোধ সে করে না, নিজেকে কারুর চেয়ে খাটোও মনে করে না। কিন্তু একটা নতুন তৃষ্ণা যেন জেগেছে—এই কালো লম্বা মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হযে। টাকা দিযে দেহ কেনা নয—মন কেনা। না মন কেনা নয়, মন জেতা। ভাবী মিষ্টি লাগছে খেলাটা।

একটা মমতা! হ্যাঁ একটা মমতা। না—মমতাও নয়। প্রথম প্রথম উদ্দেশ্যটার মধ্যে কুটিল এবং জটিল কিছু না থাক—খুব সোজা সহজও ছিল না। একটা খেলার ইচ্ছা ছিল। কাঙাল মেয়ের কাঙালীপনা এবং মেয়ের মধ্যে চিরন্তন কালের যে সত্য নারী-পুরুষ সাহচর্যে উত্তপ্ত হযে বিগলিত হয়—তার সন্ধান করবার জন্য কৌতূহল লেগেছিল। ভেবেছিল—তাকে আবিষ্কার করেই বলবে—ওগো মেযে তোমাকে আমি খুঁজি—মানে পুরুষ বরাবর খোঁজে—কিন্তু এই দেউলে কালো রূপের আবরণের মধ্যে তোমাকে পেতে আমার আর ইচ্ছে হচ্ছে না। কিন্তু কযেকদিন একসঙ্গে শ্যামবাজার পর্যন্ত যাওয়ার ফলে—মনের মধ্যে আরও কিছু যেন জাগল। ভাল লাগল—মেয়েটির সারল্য। সোজা মন সহজ মন। মনটি অনুদ্ধত বিনীত বটে কিন্তু ঠিক যেন কাঙাল নয়। ভাললাগার স্বরূপটা বেশ চিরে চিরে কেটে কেটে দেখলে আনন্দ। মনে হলো একটা করুণা নামক বস্তু কেমন করে বর্ষার জলে-ভেজা শুকনো ডাণ্ডা দূর্বাঘাসের

মতো মাথা তুলে একটু সবুজ আভা ফুটিয়েছে। মনকে সে সাবধান করেছিল। উঁহু—এ ভাল নয়। সে সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ছে। এমন কি পুরীর কাণ্ডটার জন্য সে লজ্জিত এবং অনুতপ্তও হয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল—-অন্যায়টা তো তারই। বন্ধুই তো ঠিক ধরেছিল। রসিকতা স্বভাবটাই সোজা জিনিসকে বাঁকা করা, সূচালো করা। সূচালো বাঁকা কিছু বিঁধলে টানলেই বেরিয়ে আসে না—খানিকটা ছাড়িয়ে নিয়ে তবে ছাড়ে। এবং এর রসটা মিষ্টি নয়, নোস্তা। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটেতে জ্বালা ধরায়। ওখানে পটুতার সঙ্গে—মুখ বেঁকিয়ে বাকা কাঁটাকে বের করে দিতে হয়। রাগ করে ও সোজা টান মেরে গেঁথে গিয়েছিল। মনে মনে সতর্ক হবার সংকল্প করে পরের দিন আগেভাগেই বেরিয়ে পড়েছিল। রাত্রে ফিরেছিল একটার পর। বেশ প্রমত্ত অবস্থায়। বার থেকে বেরিয়ে—ট্যাক্সি করে ঘুরেছিল। পার্ক স্ট্রীট -ফ্রি-স্কুল স্ট্রীট ঘুরে অনেক বাঙালিনী এবং ফিরিঙ্গিনীর দেখা পেয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে ব্রণমুখীকে খুঁজে পায়নি।

সকালে ঘুমিয়েছিল আটটা পর্যন্ত।

স্নান করে মাথাটা সুস্থ করে কাজে মন দিয়েছিল। একবারও জানালার দিকে তাকায়নি। চড়ুই পাখিটার আসা-যাওয়ার বিরাম ছিল না। ওর কুটো মুখে করে আসা-যাওয়ার বিরাম নেই! একসময় তার রাগ হলো। সে কাজ করছিল—ঘরের মাঝখানে বসে, জানালাটাকে টেবিলের সামনে রেখেছিল বটে কিন্তু নিজে বসেছিল অনেকটা পিছন হয়ে। একসময় পাখিটার মুখ থেকে একটুকরো ঘাস খসে স্কেচের উপর পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে পাখিটাকে খেদিয়ে দিয়ে -বইয়ের তাকের উপর থেকে কুটো দিয়ে আধ গড়া বাসাটাকেই ভেঙে দিয়ে এসে কাজ করতে বসেছিল। নিশ্চিন্ত মনে কাজ করছিল, মনটা অনেকটা একাগ্র হয়েছিল; পাখিটা আবার এসে বাসাটার অবস্থা দেখে সে যে এক কি ধরনের ডাক ডাকতে শুরু করেছিল—সে যে না শুনেছে তাকে বোঝানো যাবে না। ঘরময় বার দুয়েক সেই ডাক ডেকে উড়ে গিয়ে জানালার মাঝের পাটাটার উপর উপুর হয়ে বসে কয়েকবার ডেকে উড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর আসেনি। কিছুক্ষণ পর কেমন একটা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা হয়েছিল আনন্দেরই। ওই একটা ক্ষুদ্র জীব- -বেচারা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে এখানে তার আশ্বাসে এবং প্রশ্রয়ে বাসাটুকু করেছিল। তার উপর এই ক্রোধ—ছি-ছি ছি। সে উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়িয়েছিল।

কই—চড়ুইটা কই? অসংখ্য চড়ুই উড়ে বেড়াচ্ছে—পার্কের গাছে, তার জানালার সামনের দেবদারু গাছটায়। ইলেকট্রিকের তারেও কয়েকটা বসে রয়েছে। কাক শালিক উড়ছে। এ ওকে তাড়া করছে। গাছগুলোর ডালপালা পাতা বাতাসে দুলছে। অনেক উপরের আকাশে চিল উড়ছে অনেকগুলো। তার মধ্যে শকুনিও রয়েছে। নামছে ওই কোণটায়। সম্ভবত কিছু মরেছে। ও দিকটায় পাতিপুকুরের পড়ো জমিগুলো। সেই গন্ধওয়ালা খালটার ধার বোধ হয়! ওইখানটায় হবে।

হঠাৎ ঘণ্টা অর্থাৎ পেটা ঘড়ি বেজে উঠল। জলের কলে ঘড়ি পিটে ঘণ্টা ঘোষণা

করছে। এক দুই, তিন, চার, বেশ জোড়া মিলিয়ে ঘণ্টা বাজায়। জোড়া মিলিয়েই ঘণ্টা শেষ হলো। তা হলে দশটা! আটটায় তো সে উঠেছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে সে। হ্যাঁ দশটা। ঘড়িটাও বাজতে শুরু করেছে। কয়েক মিনিট স্লো হয়েছে তা হলে। কিংবা জলের কলেই দু' মিনিট আগে বাজিয়েছে। কলে আর মানুষে অনেক তফাৎ। মানুষ অধীর হয়, কল তা হয় না। তবে তেল না পেলে—বেগড়ায় বটে। কিন্তু তার ঘড়ি বেগড়ায়নি।

হঠাৎ সে মনে মনে চমকে উঠল।

জানালাটা বন্ধ করতে হবে। লেডিজ ছাতা দেখা যাবে এক্ষুনি। জানালাটা বন্ধ করে দিলে আনন্দ। খোলা দেখলেই লেডিজ ছাতা থমকে দাঁড়াবে। কিংবা এসে বারান্দায় উঠবে। সে সাহস তার হয়েছে! হরিয়াকে ডাকবে।—বাবু রয়েছেন? কি কবছেন? ছবি আঁকছেন বুঝি? হয় তো বলবে—একবার খবর দাও না। কি আঁকছেন দেখি! কিংবা বলবে—ফুল এনেছিলাম—দেব!

সে হতে সে দেবে না! জীবনে বিকিকিনিটাই ভাল। নগদ বিকিকিনি। বিকিকিনি সবই। তবে ধার আর নগদ। ধারে দেওয়া-নেওয়ার বাঁধন পড়ে। এ কালে—'আজ নগদ কাল ধার' এ বোর্ডটা দোকানেও বাতিল হয়ে গেছে।

আনন্দ ডাকলে—-হরিয়া!

—যাই।

এসে দাঁড়াল হরিয়া। নীরবে। ওটা ওর স্বভাব।

আনন্দ বললে—শোন—ওই—এ যদি আসে না—

—কে?

—ওই যে সেই মেয়েটি রে!

হরিয়া বললে—বাজারে দেখা হলো সে শুধাচ্ছিল।

—কি শুধাচ্ছিল?

—বাবু কেমন আছেন? কাল দেখলাম না! কাজে গিছলেন বুঝি?

—কি বললি?

—বললাম—হ্যাঁ।

একটু চুপ করে থেকে আনন্দ জিজ্ঞাসা করলে—আর কিছু জিজ্ঞাসা করেনি?

বলছিল—কখন ফিরল বাবু? রাতে যখন ফিরলাম—তখনও তো জানালা বন্ধ ছিল।

—হুঁ। বললি তো অনেক রাতে?

—হুঁ বললাম।

—বেশ করেছিস। এখন যদি আসে-যায় সে এই সময়—বলবি—আমি বেরিয়ে গিয়েছি বুঝলি!

—হুঁ।

চলে গেল হরিয়া। আনন্দ জানালা-বন্ধ ঘরের অন্ধকারে ঘুমের রেশ অনুভব করলে। কাল অনেক রাত্রি জেগেছে। অন্ধকার হলেই ঘুমের আমেজ আসছে। সে বিছানায় শুয়ে পড়ে বললে—টেবিল ফ্যানটা মাথার গোড়ায় দে।

হরিয়া বললে—একটা টাঙানো পাখা কেন। দিব্যি ঘুরবে।

—না। ওতে মশারি খাটিয়ে হাওয়া মেলে না।

ঘুমিয়ে পড়ল সে।

হরিয়া তাকে ডেকে তুললে খাবার সময়। টেবিলে চায়ের প্লেটে মতিয়া বেল রয়েছে। একটু হাসলে সে! তারপর মনে হলো—লুকোচুরি খেলছেই বা কেন সে? সোজা কেনাবেচার কথা—বলতেই তো পারে।

তাই বলবে সে! খেয়েদেয়ে বেরিয়ে গেল সে। সন্ধ্যেতে সকালেই ফিরলে। একটা কোয়ার্টার পাঁইট কিনে নিয়েই ফিরেছিল। খেয়ে সে সামনের বারান্দায় টেবিল ফ্যানটা খুলে একটা নীলবাল্বের স্ট্যান্ডিং ল্যাম্প জ্বেলে বসে রইল। কিন্তু মেয়েটিকে তো ফিরতে দেখলে না সে। দেহে মনে সে বেশ প্রফুল্ল ছিল। ঘুমিয়ে শরীর সুস্থ হয়েছে। সারা দিনে কাজ করেছে অনেক। তারপর সন্ধ্যের সময় থেকে বসে আছে তার প্রতীক্ষায়। কিন্তু সে কই?

হঠাৎ একসময় উঠে নির্জন রাস্তাটায় পায়চারি করতে করতে কখন যে ওদের বাড়ির ধার পর্যন্ত গিয়ে পড়ল—তা তার খেয়াল ছিল না। খেয়াল হতেই থমকে দাঁড়াল।

যাবে না কি ওদের বাড়ি? গিয়ে ডাকবে—শ্যামলীদেবী আছেন? কাজল বলে ডাকা চলবে না। না। মুখে মদের গন্ধ উঠছে। পাড়ার ছোঁড়ারাও ভাল নয়। ওর মাও অত্যন্ত খট্‌বোগা! ফিরে এল সে।

এসেই মনে হলো—আবার বেরুবে সে, বারে যাবে। এ যেন কেমন সব ফাঁকা শূন্য হয়ে গেছে। জীবনটার রঙ হারিয়ে যাচ্ছে! সে ডাকলে—হরিয়া!

—যাই।

—আমি বেরুচ্ছি। বলে সে ঘরে ঢুকে স্যুট পরলে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিল সে নিজেকে। হঠাৎ আয়নার ভিতর দেখলে পিছনের দেওয়ালের আলমারিতে বইয়ের থাকের উপর চড়ুইটা বসে আছে। নিশ্চিত হয়ে বুকটা পেড়ে চোখ বুজে ঘুমুচ্ছে।

ভাল লাগল তার। যাক কৃষ্ণের জীবটি ফিরেছে। কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি তার নাই কিন্তু জীবটির প্রতি করুণা আছে। হাসলে একটু।

হেঁটেই বেরিয়ে গেল। বাস ধরে শ্যামবাজার যাবে। সেখান থেকে ট্যাক্সি নেবে। শ্যামবাজারে এসে ট্যাক্সিতে চড়ে কিছুদূর গিয়েই বললে—ঘুরিয়ে নাও ট্যাক্সি। জরুরী কাজ ভুলে এসেছি। চল!

ঘণ্টাখানেক না যেতেই ফিরল সে।—শরীরটা যেন অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হচ্ছে। ঘরে এসে হরিয়াকে বললে —খেতে দে!

পরের দিন সে দশটা নাই বাজতে বাইরের বারান্দায় বসে ছবি আঁকতে শুরু করলে। ঢং ঢং করে ঘরের ঘড়িতে দশটা বাজছে, আজ কলের ঘড়িতে এখনও বাজেনি। চড়ুই পাখিটা চ্রিক-চ্রিক শব্দ করছে। এরপর ঘড়ির কাঁচে ঠোকরাবে। বলবে বোধ হয়, থামলে কেন? আনন্দের দৃষ্টি কিন্তু সামনের দিকে। অর্থাৎ পূর্বদিকে।—ওই—ওই—লেডিজ ছাতা!

সে বসেই রইল। বুকের স্পন্দন খানিকটা বেড়ে গেল। একবার মন বললে— এ করছ কি? মনই উত্তর দিলে—কেন? যা কাল থেকে ভেবে রেখেছি তাই করব। সোজাসুজি বলব। দেখ আমি এ যুগের অতি আধুনিক। তুমি যদি অতি আধুনিকা হতে পার—তবেই আলাপের জেরটা চলুক। নইলে বল, এখানেই শেষ হোক পালা।

মনের সঙ্গে মনের কথা শেষ হতে-না-হতে ছাতা কাছে এল। ছাতাটা মধ্যে মধ্যে পিছনে হেলছে। মানে সে তাকে দেখেছে। ওর নিজের মনের কথা ওইখানেই খেই হারিয়ে শেষ হয়ে গেল। চাঞ্চল্যের মধ্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, যেন কথা বলবার জন্যেই উঠে দাঁড়াল।

সেও থামল। এবং হাসল। কাজলের দাঁতগুলি বড় সুগঠিত। ঝিকমিক করে ওঠে। কালোমেঘের বুকে হাল্কা বিদ্যুতের মতো হাসিটা দাঁতের সারির সাদা ঝিলিক হেনে ফুটে ওঠে। সেই আগে বললে—খুব কাজ করছেন বুঝি?

মিথ্যে বলতে বিব্রত হলো আনন্দ। মিথ্যে সে বলে না। তবে বলতে কোন প্রেজুডিস তার নেই। কিন্তু অনভ্যাসে থতমত খেতে হয়। বললে—হ্যাঁ। কাজ করছিলাম। তবে খুব না।

—রাতে বুঝি খুব বেড়ান?

সে তাকালে তার মুখের দিকে অত্যন্ত সহজ মুখ সরল দৃষ্টি। আনন্দ বললে—হ্যাঁ, পরশু একটার পর ফিরেছি। হোটেলে গিয়েছিলাম।

কাজল এতেও হাসলে। বললে—হোটেল খুব ভাল লাগে বুঝি? আর্টিস্ট লোক তো। বিস্মিত হলো আনন্দ। এ তো বিচিত্র মেয়ে। যে কথাটা বললে তাতে হোটেল যাওয়া সম্পর্কে তার তো কোন গা ঘিন-ঘিন করা মনোভাবের পরিচয় নেই। এ দেশের অর্ধশিক্ষিতা মেয়ে...! তবে কি সে ওই মেয়েদের দলে গিয়ে পড়েছে যারা কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রুটির টানে, পেটের দায়ে, লোভের আকর্ষণে হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যের পর গিয়ে পৌঁছয় এসপ্লানেডে?

—রাগ করলেন?

—কেন?

—কথাটা বললাম বলে?

—না। হাসলে আনন্দ। তারপর হঠাৎ ঝপ করে জিজ্ঞাসা করে বসল—

—হোটেল দেখেছেন? গেছেন কখনও?

—ওই সব জায়গায় এত আলো এত জাঁকজমক, যেখানে চায়ের কাপ আটআনা সেখানে আমি কোথায় যাব? তবে অবাক হয়ে বাইরে থেকে দেখেছি!

—যাবেন ?

—না।

—কেন ? আমি নিয়ে যাব।

—না। একটু চুপ করে থেকে মেয়েটি হঠাৎ বললে—দেখুন ক্যানভাসারি করি পেটের দায়ে। জীবনে না আছে অর্থ না আছে রূপ না আছে গুণ। কোন রকমে কবে খাই। ক্যানভাসারি করতে গিয়ে হোটেলে যাওয়া লোকেদের দেখেছি। তারা তো ভাল লোক নয়! অন্তত আমাব পক্ষে। একটি বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল তাব মুখে।

আনন্দের কথা হাবিয়ে গেল। হোটেলে যাওযার কথা বলবার জন্যে একটু লজ্জা হলো তার। মেয়েটি বললে—আমি যাই। ক'টা বাজল ?

হাতঘড়ি দেখে আনন্দ বললে—সাড়ে দশটা।

—বড্ড দেরি হয়ে গেল। আমি যাই।

আনন্দ কিছু বলতে পারলে না। কাজল চলে গেল। কযেক মিনিট দাঁড়িযে থেকে আনন্দ ঘরে ঢুকে যত তাড়াতাড়ি পাবে পোশাক বদলে বেবিযে পড়তে চাইলে। সে যাবে, ওকে গিয়ে বাসস্ট্যান্ডে ধরবে। বলবে—আমাকে মাপ করুন।

আনন্দের ব্যস্ততায চড়ুই পাখিটা চঞ্চল হয়ে ফর ফব কবে ঘবময় পাক খেতে লাগল। আনন্দের নজরে পড়ল আবার সকাল থেকে কুটো কুড়িয়ে এনে বইযেব থাকের মাথায় জড়ো কবে বাসা বাঁধছে। একটু হাসলে। বুঝলে কাল সে বাসাটা ভেঙে দিয়েছিল বলেই আজ পাখিটা আনন্দেব ব্যস্ত হয়ে ঘোবা-ফেরা দেখে ভয় পেয়েছে। সে হেসে বললে—ভয় নেই চড়ুই সখী। ভয নেই। বাঁধো তুমি, বাসা বাঁধো।

খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে সে বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি এসে দেখলে—কাজল বাসে বসে আছে। বাস ছাড়ছে। সে হাত তুলে হাঁকলে—রোখো ভাই রোখো! এই!

বাসটা ছেড়ে দিয়েছে। সে বাসস্ট্যান্ডে এসে হাঁপাতে লাগল। ভাবছিল—কি করবে ? ফিরে যাবে ? পরের বাসে গিযে তো ওকে ধরতে পারবে না।

ওই বাসটা চলে যাচ্ছে। ওই দূরে—পবের স্টপে থেমেছে! পরের বাসখানা হাঁকছে—শ্যামবাজার—শ্যামবাজাব!

ও—কি? পরের স্টপে কালো মেয়ে নেমে পড়েছে। ওই তো—ওই তো! ওই ফিরে আসছে।

বোকা মেয়ে। ও এখানে আসতে আসতে এখানাও ছেড়ে চলে যাবে! কিন্তু ও বুঝতে পেরেছে যে আনন্দ তার জন্যেই ছুটে এসেছে। ও নেমে পড়েছে।

একখানা রিক্সা ডেকে সে চড়ে বসল—চল্। যা নিবি দেব। পথে ওই ও দাঁড়িয়েছে, রিক্সায় আনন্দ আসছে—তা দেখেছে কাজল। পথে রিক্সা থামিয়ে আনন্দ বললে—উঠুন।

সে স্বচ্ছন্দে উঠে বসল। বললে—কই বললেন না তো যে আপনি বেরুবেন!

আনন্দ বললে—না। কিন্তু আপনি আসবার পরই আমার মনে হলো—আপনার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই চাওয়া উচিত।

বিস্মিত হয়ে সে বললে—কেন ? আমার কাছে ক্ষমা চাইবেন ? কিছু তো হয়নি।

—হয়েছে। আপনাকে হোটেলে যেতে বলিনি ? আমার অন্যায় হয়ে গেছে।

কাজল চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। তাবপর বললে—দেখুন, পাড়ার খারাপ ছেলেরা থেকে পথে আপিসে দোকানে নানান জনেই নিত্যই এমন কথা ইশারায় বলে—স্পষ্টও বলে। শোনাটা সয়ে গেছে। তবে আপনার কথাটা তো সে ভাবে আমি নিইনি। হোটেল দেখাতে চেয়েছেন, তার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকি, ওখানকার খাবারেব কত নামডাক—গরীব মেয়ে তাই যাইনি—খাওয়াতে চেয়েছেন। এই ভাবেই নিয়েছিলাম। সাধারণ মানুষ তো নন আপনি! সে আমি ওই ছোট ঘটনাটি থেকেই বুঝেছি। ওই চড়ুইটার প্রতি যে মমতা দেখেছি! একটু চুপ করে থেকে সে আবাব বললে—নইলে এমন সাহস করে আপনার সঙ্গে মিশতে পারি? ভাবি কি জানেন—ভাবি—সামান্য একটা চড়ুইকে যে এমন ভালবাসে—সে আমার মতো মেয়ে কালো মূর্খ হলেও—মানুষ ভেবে নিশ্চয় ভালবাসবে।

চড়ুই পাখিটার প্রতি আনন্দ মনে মনে কৃতজ্ঞ হলো। পরক্ষণেই সত্যটা মনে পড়ল। বললে—যদি বলি—চড়ুই পাখিটা সেদিন আপনার জন্যেই বেঁচেছে!

—তার মানে ?

—তাব মানে, যেমন ওটা এসে ঝপ কবে চোখের উপর পড়ে নখ দিয়ে চোখের কোণ বিঁধে ধরলে—অমনি ওকে নিষ্ঠুর আক্রোশেই ধবেছিলাম হাতেব মুঠোতে চেপে। টিপে ওটাকে পিষে আছাড় মেরেই ফেলতাম কিন্তু সেই মুহূর্তেই আপনি বলে উঠলেন—আঃ—এ যে চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছে! কথাগুলো ঠিক মনে নেই কিন্তু এমন মিষ্টি মমতার সুর শুনে আপনার মুখের দিকে তাকালাম—দেখলাম সেখানেও কত মাযা কত উৎকণ্ঠা। আমি আব পাখিটাকে মাবতে পাবলাম না। দেখলাম আমাব হাতেব চাপেই মব মব হযেছে। তখন ওকে বাঁচাতে ইচ্ছে হলো।

শ্যামলী চুপ কবে বইল। একটু পবে বললে—না-না। আপনাব মনেই ওসব ছিল। আমি না ডাকলেও, না এসে পড়লেও—এই ই কবতেন! প্রথম আঘাতেব ঝোঁকে আক্রোশ হয, বাগ হয়। কিন্তু যার দয়া-মমতা আছে, হৃদয আছে তার সে সব পরমুহূর্তেই জেগে ওঠে। নইলে আমার মতো সামান্য কালো একটা গবীব ক্যানভাসার মেয়ের স্নেহ-ভালবাসাব দাম আপনাব কাছে কতটুকু ?

—অনেকটুকু! আপনি জানেন না। বলে আনন্দ সামনেব দিকে চেয়ে বইল। ওর বিচিত্র মন। মন মনের সঙ্গে কথা কয় এক একজন মানুষের। আনন্দেব মন—সেই মানুষেব মন। মন বললে, সেন্টিমেন্টাল হযে পড়েছে। মনই ধমক দিলে—কথা বলো না থাম। কোন মেযের সঙ্গে কথা বলে এমন আনন্দ তো হয়নি কোন দিন। এ কথা কাটাকাটির বাণ-যুদ্ধ নয়, তলোয়ার খেলা নয়; এতে হার-জিতের খেলাই নেই। এ মেয়ে তা খেলে না বলেই—মনকে অভিভূত করে গভীরে কি যেন স্পর্শ

করে; সেটা হৃদয় হলে হৃদয়। হৃদয় স্পর্শ করা আর কথার মারপ্যাঁচে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বাড়ানো আলাদা ব্যাপার!

রিক্সায় ওরা দু'জনেই চুপ হয়ে বসেছিল। সাড়ে দশটা বেজে গেছে। বাস, ট্রাক, মোটর, গরুর গাড়ি, ঠেলার ভিড়ে রাস্তা প্রায় জাম হয়ে গেছে! ওদের কিন্তু কেউ দেখছে না। একটি ছেলে এক মেয়ে রিক্সায় চলেছে—এ একটা সাধারণ ব্যাপার!

হঠাৎ ওরা সচেতন হলো। একটা মোষের গাড়ির সঙ্গে একটা মোটর কারের ধাক্কা লেগেছে। বিশেষ কিছু নয়, জখম কেউ হয়নি, মোটর কারটাই মোষের গাড়ির লিগের সঙ্গে দরজার ঘেঁষ লাগিয়ে জখম হয়েছে! শ্যামলী বলে উঠল—যাক—কারুর লাগেনি।

আনন্দ কথা বললে না।

শ্যামলী আবার বললে—নতুন মোটর, দরজাটা কি হলো দেখুন! এঃ!

আনন্দ এবারও কথা বললে না।

শ্যামলী বললে—কি ভাবছেন বলুন তো!

আনন্দ ফিরে তাকালে ওর দিকে। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে রইল! শ্যামলী লজ্জা পেলে! আনন্দ বললে—আজ থেকে আমরা বন্ধু, কেমন?

—বন্ধু? আমি আপনার বন্ধু?

—হ্যাঁ, আরও একদিন বোধ হয় বলেছি। আজ পাকা হয়ে গেল।

শ্যামলী হঠাৎ চোখ বুজল। একটা আবেগ ওকে বিচলিত করে তুলেছে! আনন্দ ওর হাতখানি নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললে—আজ থেকে আমরা আপনি নই। তুমি।

ঘাড় নাড়লে শ্যামলী—না।

আনন্দ বললে—আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না?

এবার শ্যামলী বলল—বা—আপনাকে আমি তুমি বলতে পারব না।

—পারবে! আজ না পার কাল পারবে।

—জানি না।

—আমি তোমাকে তুমি বলব।

শ্যামলী হাসলে—সে হাসি অত্যন্ত মিষ্ট—বললে—খুব ভাল লাগবে আমার।

আরও কতকটা দূর ওরা পরস্পরে হাতে হাত রেখে চুপচাপ চলল। তারপর আনন্দ বললে—তুমি আরও পড়—কাজল। তোমাকে কাজল বলব কেমন?

সলজ্জ হেসে ঘাড় নেড়ে কাজল জানালে—হ্যাঁ তাই বলো! তারপর বললে—পড়ব? কি করে পড়ব? পড়ার খরচ কোথায় পাব? খাবই বা কি?

—ব্যবস্থা আমি করব।

—না। টাকা নিতে আমি পারব না।

—আমি তোমাকে একটা ভাল চাকরি দেখে দেব।

—ভাল চাকরি?

—হ্যাঁ।

—সে খুব ভাল হবে। কাজলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রিক্সা তখন শ্যামবাজারে এসে পড়েছে।

পরের দিন—কাজল আবার অনেকগুলি ফুল মতিয়া বেল ওকে এনে দিল। নিজেই প্লেটে সাজিয়ে—আনন্দে কাজের টেবিলেব পাশে একটি টিপয়ের উপর রেখে দিলে। আনন্দ হাসলে। আনন্দের হাসি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অবাধ্য মন মনে মনে বললে—মালা গেঁথে আনতে পারলে না?

ঘডিতে দশটা বাজতে শুরু করল। চড়ুই পাখিটা এসে ব্রাকেটে বসে লেজ নাডিয়ে চিরিক—চিরিক শব্দে ডাকতে লাগল।

কাজল বললে—আবে এটা তো বেশ!

আনন্দের আব কথাটা বলা হলো না। সেও হেসে বলল—হ্যাঁ- ও বেশ।

*　　　　*　　　　*

ওই কথাটা মালার কথাটা বললে আনন্দ সেদিন। বন্ধুত্ব পাতানোর অনেক দিন পব। ভিক্টোবিযা মেমোরিযালের সামনে।

কাজল বললে ওর বাড়িব ফুলের কথা।

আনন্দ বললে—মালাব কথা। বললে—ফুল হলো ঝবে গেল। আমাব টেবিলে সাজিযে দিলে শোভা হযেই বইল। মালা গাঁথতে তো পারলে না।

কাজল সলজ্জভাবে হেসে বলেছিল, বক্রদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিযে বলেছিল- -বেশ গাথব। পরবে তো!

—পবালে নিশ্চয পবব। বান্ধবীব মালা পবব না। কিন্তু ববমাল্য করতে চেযো না।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিল —বেশ তাই —তাতেই যদি খুশি হও তবে তাই হবে!

কালকের কথা। এর মধ্যে কিন্তু বেশ কিছু দিন চলে গেছে। বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পাব হয়ে গেল। চাব-পাঁচ মাস চলে গেল। এর মধ্যে ঘটেছে অনেক কিছু ছোটখাটো, বড একটা ঘটেছে। ক্যানভাসারি ছেড়ে দি" কাজল উইলিযামস্ কোম্পানির আপিসে রেকর্ড কীপারের চাকরি করছে। সেখানে রেকর্ডরুমে বসে থাকে—আর বই পড়ে। ডাক পডলে ফাইল খুঁজে হাতে নিযে উঠে যায হাসিমুখে। ঠোঁটে ওকে লিপস্টিক মাখতে হয়। চুল ওর সম্পদ। তার কায়দা ওর পুরাতন। ভাল শাড়ি-জামা পরতে হয়। ইংরাজীটাও দুরস্ত হয়েছে।

কাজটা কবে দিয়েছে আনন্দই।

উইলিয়ামস্ কোম্পানির সাহেব আনন্দের প্রকৃতিব জন্যে এবং তার কাজের জন্যে তাকে ভালবাসে। সাহেবকে আনন্দ বলেছিল।—একটি মেয়েকে একটি কাজ দিতে পার সাহেব?

জু সাহেব দিলদরিয়া মেজাজের লোক। সে রসিকতা করেছিল। বলেছিল—তোমার তো কেউ নেই। কার জন্যে কাজ চাচ্ছ?

—ফ্রেন্ডও কি থাকবে না সাহেব!

—গার্ল ফ্রেন্ড?

—যদি বলি হ্যাঁ।

—তাহলে দেব। নিশ্চয় দেব। কি কাজ করতে পারবে?

—বড় কাজ পারবে না সাহেব। ম্যাট্রিক ফেল

সাহেব তাকে রেকর্ড ডিপার্টমেন্টে কাজ দিয়েছিল বুড়ো রেকর্ড-কীপারের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে। মাইনে সব নিয়ে একশো দশ টাকা।

শ্যামলী অবশ্য ইন্টারভ্যুতে সাহেবকে খুশি করেছিল। সাহেব বলেছিল আনন্দকে—ভেরী সার্প ইন্টেলিজেন্ট, তার থেকেও বেশি বয—চার্মিং বিহেভিয়ার। শী ইজ এ গুড গার্ল। যা ভেবেছিলাম তা নয়। তুমি ওকে বিয়ে করবে?

—না—না সাহেব। সে সব নয়।

শ্যামলী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে অনেক। তাতে তার ত্রুটি হয়নি। তার জন্যে কৃতজ্ঞতা সে কোনদিন চায়নি, কোন মূল্যও কামনা করেনি। শুধু ভাল লেগেছে তাই সে করেছে। তার বেশি কিছু নয়।

* * *

এর পর থেকে দু'জনের বন্ধুত্ব বল বন্ধুত্ব প্রীতি বল প্রীতি, প্রেম বলতে আনন্দের আপত্তি আছে। ফুলের মালা যাতে বরমাল্য না হয় সে দিকে ও সতত জাগ্রত। মেয়েটির উপকার করতে ওর ভাল লেগেছে। হয় তো করুণা। কিংবা মমতা। তাছাড়া ওকে যেন ও নতুন করে গড়ছে। একটি অর্ধসমাপ্ত মূর্তিকে ও যেন ঘষে মেজে রঙ দিয়ে পরিপূর্ণ করে তুলছে। খেলাই সে শুরু করেছিল—খেলা এখনও খেলাই আছে কিন্তু খেলার রকমটা পাল্টেছে। আনন্দই ওকে সাজতে শিখিয়েছে, রুচি শিখিয়েছে। কিছু কিছু পোশাকও উপহার দিয়েছে। কিন্তু শ্যামলীর নিজেরও গুণ আছে, সামান্য পোশাককে রুচির সঙ্গে পরে দুইয়ে মিলে, অসামান্য নিশ্চয় নয়, তবে বেশ সুশোভনা হতে পারে। ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ে যে ইংরেজীটুকু শ্যামলী—না—কাজল শিখেছিল—এবং যা ও ক্যানভাসারি ও টিউশনি করতে গিয়ে ভুলে গিয়েছিল—সেটুকুও আনন্দই আবার সাহায্য করে রপ্ত করে দিয়েছে। জানাজানিও হয়ে গেছে পাড়ায় এবং মায়ের কাছে। পাড়ার ছেলেরা ওর সাজসজ্জায় এমন সুচারু ভোল বদলের জন্যে এবং লিপস্টিকের জন্য বলে মেমসাহেব। তবে সাহেব কোম্পানির চাকরি, এটা ওকে একটা ইজ্জত দিয়েছে।

আনন্দ মধ্যে মধ্যে ওদের বাড়িও যায়। শ্যামলী না—কাজল—সকালে আপিস যাবার সময় নিত্যই যায় আনন্দের কাছে।

পাড়ায় জানে আনন্দ ওর উপরওয়ালা। সাহেব কোম্পানির বাঁধা আর্টিস্ট আনন্দ

এখন ওর সঙ্গে আর শ্যামবাজার যায় না। এখন ওর সঙ্গে দেখা হয় নিত্য বিকেলে। ওইটেই পাকা বন্দোবস্ত হয়েছে। ওদের দেখা হওয়ার নির্দিষ্ট স্থান এসপ্ল্যানেডে ট্রামের দোতলা ঘরটার নীচে। ওখান থেকে কোনদিন সিনেমায় যায়, কোনদিন গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে। আনন্দ ওকে নিজের জীবনের কথা বলেছে। শ্যামলীও বলেছে। ওর জীবনের কথা আর কি? শুধু দুঃখ-কষ্টের কথা। অপমানের কথা। আনন্দ একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল—ভালবাসনি কাউকে?

সেদিন গঙ্গার ধারে বসেছিল ওরা। কাজল খিল খিল করে হেসে বলেছিল—আমি তো দুনিয়াসুদ্ধ লোককেই ভালবাসতে চাই। কিন্তু কালো মূর্খ মেয়েকে ভালবাসতে দেয় কে? বন্ধুই জীবনে আমার একজন, প্রথম ও শেষ। সে তুমি! বান্ধবীও সেই। যাদের সঙ্গে হয়েছিল—তারা বিয়ে হয়ে কে কোথায চলে গেছে। আমি পড়ে আছি একলা।

কাজলের ছবিও এঁকেছিল আনন্দ। কাজল তার সামনে বসে থেকেছে ছবি আঁকাবার জন্য। সে ছবি একজিবিশনে নাম করেছে, প্রাইজ পেয়েছে। সে বলে—আমি ধন্য হযে গেছি। কিন্তু তার জন্য আনন্দ তাকে টাকা দিতে চেয়েছিল, সে নেয়নি। কিছুতেই নেয়নি।

বলেছিল—আমার রূপ নেই। ও রূপ যা ছবিতে তুমি দিয়েছ তা তোমার দেওয়া, তোমার সৃষ্টি। আমি ধন্য হয়েছি ছবি আঁকিযে। কিন্তু ওর জন্যে টাকা নিলে তোমার কাছে আমি দাঁডাতে পারব না। আমি কেনা হয়ে যাব।

— ছবিটা যে পাঁচশো টাকায় বিক্রি হযেছে কাজল।

—তা হোক। তুমি বরং আমাকে একখানা শাড়ি কিনে দিয়ো।

শাডি সে নিযেছে। কিন্তু সেও ছ'খানা এন্ডিল রুমাল তাকে উপহার দিয়েছে। সে তাকে ফুল দেয়, রুমাল দেয়, ছোটখাটো জিনিস নিতান্তই মূল্যের দিক থেকে নগণ্য—এ তাকে দেয। মাটির পুতুল তার ভাল লাগলে তাও দিয়েছে।

কাল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে ওরা বেডাচ্ছিল। একটু বেলা ছিল। আষাঢ় মাসের বেলা। বেলফুলের মালা, চাঁপাফুল, যুঁইয়ের গোড়ে বিক্রি হচ্ছিল। কাজল বলেছিল—আঃ আজকাল যা আমার টবের গাছে ফুল দিচ্ছে কি বলব তোমাকে! এই বড বড এবং অজস্র ফুটছে।

সে খপ্ করে সুযোগটা ধরেছিল। না। ঠিক সুযোগ সে ধরেনি। সুযোগ সে নেয় না। হ্যাঁ—সঙ্কোচ একটা ছিল যেটা কাটিয়ে নিতে পেরেছিল। মানুষের জীবনে যেটা ন্যায্য পাওনা সেটা দাও বলবার একটা সময় আছে, সেই সময়টা এসেছিল অকস্মাৎ, শ্যামলীই যেন এনে দিয়েছিল সে সময়। সে বলেছিল বেল ফুলের কথা।

—আজকাল যা আমার টবের গাছে ফুল দিচ্ছে কি বলব তোমাকে! এই বড বড় এবং অজস্র।

সে বলে উঠেছিল—মা সেগুলি গর্তে ফেলে পচাচ্ছে তো।

—হ্যাঁ। আমি আব কি কবব? আগে তোমার ওখানে দিয়ে আসতাম। এখন ববাবব চলে আসি।

—মালা গাঁথলেই পাব।

—কি হবে?

—পববে।

—মা ঝাড়ু মাববে।

—তাহলে পবাতে পাব।

— পববে? তুমি?

—বান্ধবী দিলে বন্ধু অবশ্য পববে। বন্ধুত্বেব মালা বন্ধনেব নয়। পাব পবাতে?

বক্র কটাক্ষ হেনে কাজল বলেছিল—পাবি না? নিশ্চয পাবি! পববে" আনব কাল!

—এনো। কালকেব সন্ধ্যাটি হযে থাকবে স্মবণীয চিবদিনেব মতো। কথা বইল?

—কথা বইল।

—দেখব।

ওবা বাড়ি ফিবল একসঙ্গে কিন্তু নীববে। কাজল দু'চাবটে কথা যা ও বললে আনন্দ তাব উত্তব দিলে না।

পাড়ায এসে আনন্দেব বাড়িব সাম'ন দু'জনে থমকে দাঁড়াল। আনন্দ বললে- কাল।

হেসে কাজল বললে—হ্যা কাল। কিন্তু তোমাব কি হলো বলতো' সাবা পথ চুপ কবে এলে?

আনন্দ বললে—কি হবে' ভাবছি কাল আমাব বান্ধবীকে আমি কি দেব?

—তোমাব দেওযাব সীমা আছে'

—ওসব কথা কাল হবে।

—বেশ—বেশ। কাল। কাল। কাল। কাল।

—হ্যাঁ, কাল আমাদেব চিবকাল স্মবণীয থাকবে।

—আচ্ছা।

আনন্দ এসে ঘবে ঢুকল। কান তাব ঝাঁ-ঝাঁ কবছে। বুকেব ভিতবটা স্পন্দিত হচ্ছে।

ঘবে পায়চাবি কবতে কবতে সে ডাকলে—হবিযা!

হবিযা এসে দাঁড়াল।—কি?

—অনেক দিন আগে বড বোতল একটা ছিল। তাতে খানিকটা ছিল। ছিল না?

—হুঁ। আছে।

—দে সেটা।

প্রায তিনমাস পব আনন্দ মদ খেলে।

পবদিন সকাল থেকে কেমন অধীব হয়ে বইল সে। বিকেল ছ'টা কখন হবে।

আজকের এই অধীর উল্লাস একটু বিচিত্র ধরনের। এমন সে কখনও অনুভব করেনি। কাজল তাকে মালা পরাবে। একটা যেন আশ্চর্য কিছু। মালা পরে কি করবে জানে না। কিছু করবে। এ যেন একটা গান—তাকে কেউ শোনাচ্ছে। সকাল থেকে—তাই বা কেন—কাল রাত্রি থেকেই কেউ শুরু করেছে গান।

জীবনের গান। জীবন তার ধন্য হয়েছে। একটি নারীকে সে জয় করেছে। তার থেকে তার রূপান্তর হয়েছে। অন্ধকার রাত্রি এসে জীবনকে তিমির নিবিড় নিশীথিনীর মতো আবৃত করে তার সকল আবরণকে হরণ করে নিয়েছে। প্রভাত হয়েছে তবু সে আলো সে তিমির নিশীথিনীর যবনিকা ভেদ করতে পারেনি। পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে সে সেই আদিম কালের মানুষেব মতো অভিসারের জন্য সেজেছে। সন্ধ্যার জন্য জপ করেছে।

সারাটা দিন কোন কাজে মন বসেনি। শুধু মন আকৃষ্ট করতে পেরেছিল—চড়ুই পাখিটা। আজ এই দু'মাসের মধ্যে সে পাখিটার দিকে মন দিতে পারেনি। তাকে সে ভুলেই গিয়েছিল। সে আছে, সে থাকত, উড়ত, ডাকত, বেরিযে যেত, ফিরে আসত, ঘড়ি বাজবার সময ঘরে থাকলে ঘড়িটার ব্র্যাকেটে বসে চ্রিক-চ্রিক করে ডাকত, ডাযেলে ঠোকরাতো। আনন্দ ঘরে থাকলেও তা দেখত কিন্তু সে চিঠি সেই দেখা নয়। হরিযা ঘোরে ফেরে--সে যেমন দেখে—তেমনি। একটি করুণা ছিল কিন্তু তার বিশেয কোন আবেদন ছিল না। যে ভিক্ষুক তার দুর্দশার জন্যে প্রথম দিন যে করুণা আকর্ষণ করে যে উত্তাপ তার মধ্যে থাকে, তার পবে সে যখন নিত্য এসে দাঁডায তখন যেমন দান পেলেও তার সে সরসতা আর থাকে না--এ তেমনি। আজ সকালে দী· দিন পর সে চড়ুইটাকে অবলম্বন করেই দিনটা কাটিয়ে দিয়েছিল। অনেক রসিকতা অনেক কথা সে তার সঙ্গে বলেছিল। দুপুরবেলা একটু শুযেছিল। কিন্তু আধঘণ্টা অন্তর তার ঘু- ভেঙেছে। ক'টা বাজল। ঘডির দিকে তাকাবার আগে কান পেতে শুনেছে মৃদু চিনিক চিনিক শব্দ উঠছে কিনা। চড়ুই পাখির ঘড়ির দরকার নেই। তার ঘুম ঠিক সময় ভাঙে। চড়ুইটার প্রথম চিনিক ডাক শুনেই সে উঠে জানালা খুলেছিল। রোদ তখনও ঝাঁ-ঝাঁ করছে। ঘড়িতে তিনটে বাজতে দশ মিনিট। তার পরও আডাই ঘণ্টা। হঠাৎ তার নজরে পডেছিল চড়ুই সখীর সখা জুটেছে। এর মধ্যে চড়ুই পাখির ডিম হয়েছিল কিন্তু ডিম দুটো ভেঙে গেছে। সখার সঙ্গে তার খেলা দেখে তার নেশা লেগেছিল।

পাঁচটার সময় বেরিয়েছিল সে তাব সব থেকে সুন্দর পোশাকটি পরে। দোকান থেকে পাখা এসেছে। হরিয়া বলেছিল, ওটা খাটাই! সিলিং ফ্যান একটা। টেবিল ফ্যানটায় চলছে না।

সে বলেছিল—থাক আজ। আজ সময় নেই আমার। কাল আসতে বলে দে।

পৌনে ছ'টায় গিযে দাঁড়িয়েছিল এসপ্ল্যানেডে ট্রাম টার্মিনাসে। অধীর আগ্রহে তাকিয়েছিল। একবার ইচ্ছে হয়েছিল ট্যাক্সি নিয়ে যায় উইলিয়ামস্ কোম্পানির আপিসে।

কিন্তু কাজল বলেছে—না। আপিসে তুমি আমাব সঙ্গে কথা বলো না। হলে আমাব লজ্জা তোমাকে নিয়ে নয় অন্য জনেব কথা সইবে না।

ছ'টা বাজতে পাঁচ মিনিটেই এসেছিল কাজল। তাব পোশাকও ছিল আনন্দেব রুচিমতো তাবই দেওয়া। গাঢ লাল ব্লাউজ, ফিকে নীল পাডহীন শাড়ি। হেসে বলেছিল—এসেছি।

সেও বলেছিল—আমি অনেক আগে এসেছি নেবাব জন্যে।

নীববে পথ চলেছিল। কথা যেন মনে মনে চলছে। অন্তত—চল। আনন্দেব তাই মনে হয়েছিল। এসে বসেছিল গঙ্গাব ধাবে নির্জনে। হাঁটতে হাঁটতে যেতে অন্ধকাব হয়ে এসেছিল। অনেকটা দূব গিয়েছিল। যেখানেই দাঁড়ায় সেখানেই যেন মানুষ। কখনও সে বলেছে—আব একটু চল। কখনও কাজল বলেছে—এখানে ওই সব লোক বয়েছে। শেষে মনেব মতো নির্জন জাযগা পেযে বসেছিল দু'জনে।

—এই নাও। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটি অ্যালুমিনিযমেব কৌটো থেকে বেব কবে খুলেছিল কৌটো। মুহূর্তে মধুব গন্ধে ভবে উঠেছিল আনন্দেব নিঃশ্বাস। মালা বেব কবে বলেছিল—

—নাও, পব।

—না। তুমি পবিয়ে দাও।

— আনন্দ!

—কি?

—না, তুমি পব।

— না। পবিযে দাও। নইলে দাও আমি তোমায পবিযে দি। নইলে থাক।

—বাবাঃ! আচ্ছা জেদী লোক তুমি। যা ধববে তুমি ছাডবে না। পবিয়ে দিয়েছিল মালা সে তাব গলায। —বলেছিল ধন্য বন্ধু।

—এবাব আমি পবিযে দি।

—না। তুমি পবে থাক। আমি সেইজন্যে গেঁথেছি।

—না।

—না।

মুহূর্তে উদ্দাম আবর্ত বাঁধভাঙা জলেব মতোই যেন কল্লোল তুলে ছুটেছিল বুক তোলপাড কবে। সে দুই হাত বাডিযে তাকে জডিয়ে ধবে নিজেব দিকে আকর্ষণ কবেছিল। কিন্তু আশ্চর্য! কাজল আর্তকণ্ঠে চিৎকাব কবে উঠেছিল—আনন্দ!

—চুপ কব, চেঁচিয়ো না। কাজল।

কিন্তু সে থামেনি, আর্তকণ্ঠেই বলেছিল— আনন্দ। না না না। দু'হাত দিয়ে তাব মুখ ঠেলে দিয়েছিল। নিজেকে ছাডাতে চেয়েছিল। কিন্তু আনন্দ তাকে ছাড়তে চায়নি। অকস্মাৎ কি কবে একটা হাত ছাডিয়ে কাজল তাকে চড় মেবেছে, খামচে দিয়েছে। প্রায় চিৎকাব কবে উঠেছে।

ঘাটের উপর মোটরের থামবার শব্দ হয়েছিল এই মুহূর্তটিতে। ছেড়ে দিয়েছিল আনন্দ। কাজল উঠে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল। ছি—ছি—ছি! ছি তোমাকে! বলে সে অন্ধকারের মধ্যেই কাপড় ঠিক করে নিয়ে হন্ হন্ করে ঢাল থেকে উপরে উঠে এসেছিল। আনন্দ কয়েক মুহূর্ত পর উঠে তার পিছন ধরেছিল। সে এর শোধ নেবে। কিছুদূর এসেই গঙ্গার ধারে জনসমাগমের মধ্যে কাজল মিশে দাঁড়িয়েছিল। আনন্দ কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে চলে এসেছিল একটা ট্যাক্সি ধরে। এসে উঠেছিল বারে। বারে মদ খেয়ে সে গোটা ময়দান ঘুরেছে ট্যাক্সিতে কাজলের সন্ধানে নয়। অন্যের সন্ধানে। যবনিকা পড়ুক। মাথায় আগুন জ্বলছে। ফিরেছে রাত্রে। রাত্রি প্রায় বারোটা। কাজলদের পাড়ার রাস্তাটার মোড়ে গাড়িকে থামতে বলে সে নামতে গিয়ে দেখল পা ঠিক নেই। তাছাড়া রাত্রি বারোটা। বললে—চলো! থোড়া দূর। বাঁয়ে রাস্তেসে।

হরিয়া তাকে ধরে নামালে। শুইয়ে দিলে। আনন্দ বললে—শুইয়ে দে।

হরিয়া শোওয়াতে গিয়ে বললে—সে এসেছিল।

—কাল শুনব। আজ যেতে দে।

সকালে উঠল সে ক্ষোভে ক্রোধে জ্বালাধরা অন্তর নিয়ে। সমস্ত কিছুর প্রতি নিষ্ঠুর আক্রোশে তার মন ভরে উঠেছে। ভুল! সে ভুল করেছে এতদিন। সকালবেলা চা দিতে এসে হরিয়া বললে—কাল রাতে সে এসেছিল। চিঠি লিখে গেল। বললে, বাবুকে দিয়ো।

—চিঠি? কে? কে লিখে গেছে—কে?

লেখা দেখে মনটা আরও জ্বলে গেল। কাজল, না শ্যামলী। সেই কালো ভিখিরী মেয়েটা। সেই। তিরস্কার করেছে। হয়তো ভয় দেখিয়েছে। ছিঁড়ে ফেলে দিতে গেল সে। কিন্তু কি ভেবে সে খুললে—-চিঠিখানা খুললে। কি লিখেছে সে।

প্রিয়তম আনন্দ,

আত্মহত্যা ছাড়া আমার পথ নেই. ভুল করেই, হয়তো অভ্যাসবশে তোমাকে বাধা দিয়েছিলাম। নিজেকে ছাড়িয়ে তোমাকে আঘাত করেছিলাম। পালিয়ে এসেছিলাম। এসপ্লানেডে এসে বুঝতে পারলাম তোমাকে হারাচ্ছি আমি। তোমাকে হারিয়ে কি করে বাঁচব আমি? এই ভালবাসা তো কাউকে বাসিনি আমি। বিশ্বাস কর। আমাকেও তুমি ছাড়া কেউ দয়া করে তো ভালবাসেনি। ভোগ হয়তো করতে চেয়েছিলো। কিন্তু বাবার কাছে শিক্ষায় তা পারিনি। সে আত্মহত্যা। সেই কারণেই, সেই অভ্যাসেই আজ তোমার প্রতি এমন রূঢ় হয়েছি। কিন্তু তারপর?

তোমাকে হারিয়ে কি করে বাঁচব? বুঝতে পারছি, নিশ্চয় বুঝছি তোমাকে হারিয়ে বাঁচতে পারব না আমি। আত্মহত্যা করতে হবে। বাঁচতে না পারলেই আত্মহত্যা করতে হবে। তাই ভেবে ফিরে তোমার বাসায় এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, বলব—আমাকে নাও। যা ইচ্ছে হয় কর। আমি ঢেলে দিলাম নিজেকে। আত্মহত্যা যদি করতে হয় আনন্দ তা হলে তোমাকে পেয়েই মরব। সে মরণে সুখ পাব। কিন্তু তুমি ফিরলে

না। আজ ফিরে যাচ্ছি। কাল আসব। আত্মসমর্পণ করতে আসব। দুপুরবেলা আসব। তুমি বাসর সাজিয়ে রেখো—এটা আমার সাধ।

—কাজল

আনন্দের ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ মন আক্রোশে পরিতৃপ্তিতে উল্লাসে ভরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার আকাঙ্ক্ষা বাসনা যেন ফেনিল হয়ে উঠল। সে আসবে। সে আসবে। এই জীবন। দিস ইজ লাইফ।

—হরিয়া!

—আঁ।

—মিস্ত্রী ডাক। পাখাটা টাঙা। আমি আসছি।

সে বেরিয়ে গিযে বাজার থেকে কিনে আনলে ফুল, নতুন বিছানার চাদর বালিশ। কিনে আনলে মদ! হয়তো কাজল শেষ মির্নাত কববে। বলবে বিয়ে কর! না। মদ খেয়ে সে শক্ত হবে। উল্লসিত হলো। ট্যাক্সিতে বসেই সে মদ খেলে খানিকটা। একটুক্ষণের মধ্যেই মাথাটা রমরম করে উঠল। ঘরে ঢুকে হরিয়াকে বললে—নতুন চাদর পাত! ফুলগুলো সে ফুলদানিতে সাজিযে দিলে। হরিয়াকে বললে—খাবার শিগ্গির তৈরি কর।

—বেরুবে?

—না।

—দশটার পর কাজল আসবে। বুঝলি? তুই আজ দুপুবে সিনেমায যাবি।

সে আসবে! সে আসবে! সে আর একটু মদ খেলে।

বেলা বারোটার সময় সে খেয়ে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল। মাথায় নতুন সিলিং ফ্যান, নতুন শয্যা। চারিদিকে রজনীগন্ধার ঝাড। সে আসবে। আয়নায় নিজেকে দেখলে। থম থম করছে তার মুখ। প্রদীপ্ত উল্লাসে উগ্র হয়ে উঠেছে। উঠুক। সে পুরুষ! নীল আলোটা জ্বেলে ঘরেব জানালা বন্ধ কবে দিল সে। নীলাভ অন্ধকাব হোক। ঘরটা ঠাণ্ডা হোক। অকস্মাৎ শব্দ উঠল—

—চ্রি-রি-ক। চ্রিক্-চ্রিক্! চ্রিক্।

পাখার ফ্ররর্ শব্দ তুলে চডুইটা বাসা থেকে বেরিযে ঘরময় উডতে লাগল।

এসে বসল কোণে। সেখান থেকে উডে হোল্ডারে। সেখান থেকে ঘরময় বেডাতে লাগল—আতঙ্কিতেব মতো। এখনও ওর জানালা বন্ধের সময় হয়নি। ও বাইরে যাবে! হঠাৎ তার মাথায় এসে ধাক্কা খেলে। কিন্তু সেবারেব মতো নয়। সঙ্গে সঙ্গেই উডে গেল। উডতে লাগল।

সে আসবে। চডুইটার উপব নিষ্ঠুর আক্রোশ হলো তার। সে এক পা এগুলো জানালা খুলে দিতে। পরমুহূর্তেই ঘুরল। আপদ! জ্বালালে! দীর্ঘদিন থেকে জ্বালাচ্ছে। সে ঘুরে এগিয়ে গেল এবং পাখার সুইচটা টিপে দিলে। বোঁ-ও শব্দে ঘুরে উঠল পাখাটা। প্রথমে ধীরে তারপর জোরে। পাখিটা দিশাহারার মতো উড়ছে। পাখাটা

নতুন। সে এক ভয়। উড়ছে। আনন্দ তাকিয়ে আছে। খট করে একটা শব্দ হলো। তারপর একটা পিন্ কুশন মাটিতে পড়ার শব্দ। পড়েছে। মদের উত্তেজনায় উত্তেজিত আনন্দ—পাখিটাকে কুড়িয়ে নিলে। থরথর করে কাঁপছে পাখিটা। তার সেই স্পন্দন আনন্দের শিরায় স্নায়ুতে যেন কেমন অস্বস্তিকর ঠেকছে। সে টিপে ধরলে। ঠোঁটের উপর নিজের দাঁতও টিপে বসল সঙ্গে সঙ্গে। সোজা হয়ে উঠতে গিয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ও কে? ও কে? ওই আয়নার মধ্যে! আদিম অরণ্যচারী হিংস্র মুখ রেখায় রেখায় বীভৎস। ও কে? আনন্দ!—এই জন্তুটা তার মধ্যে ছিল! এই জন্তু সে! এমন জন্তু? তার হাতখানা রক্তাক্ত হয়ে গেছে। পাখিটার রক্ত! গরম। বড় বেশি গবম। এও গরম! ভয় পাচ্ছে আনন্দ আয়নার মধ্যে মূর্তিটা দেখে। নীলাভ অন্ধকারের মধ্যে ওই ভয়ঙ্কর হিংস্র মানুষ,—ওঃ! সে চোখ বন্ধ কবে বারবার মাথা ঝাঁকি দিয়ে যেন সজোরে সবেগে অস্বীকার করে বললে না—না—না।

—হরি!

চমকে উঠল আনন্দ।

পরমুহূর্তে আবার ডাক এল—আনন্দ!

আনন্দ মরা পাখিটা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। বীভৎস—বক্তাক্ত হাত। মরা পাখিটার চোখ দুটো আশ্চর্য কালো এবং করুণ! ওঃ!

—আনন্দ, আমি এসেছি।

আনন্দ আর্তকণ্ঠে বলে উঠল—না—না—না। ফিরে যাও। তুমি ফিরে যাও! আনন্দ পাগল হয়ে গেছে ভয়ে, দুরন্ত ভয়ে!

—রাগ করো না তুমি আনন্দ!

আনন্দ চিৎকার করে বললে—না--না---না।

হঠাৎ সে থেমে গেল। দৃষ্টি শূন্য হয়ে গেল।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল রবিবর্মার একটা ছবির কথা। ছেলেবেলায় দেখেছিল। জটায়ুবধ। রাবণ হিংস্র নিষ্ঠুব জন্তুর ভঙ্গিতে পৈশাচিক আনন্দ; চোখে ক্রোধ, নিষ্ঠুর কৌতুক; হাতে তলোয়ার, জটায়ুর পক্ষচ্ছেদ করেছে, বিরাট জটায়ু পড়েছে। বেপথু সীতা কাঁপছে।

সে কি রাবণ? চড়ুইটা কি ছোট থেকে বড হযে উঠেছে? প্রকাণ্ড বড? জটায়ু? ও ঘরে কাজল থর থর করে কাঁপছে?

না—না। সে রাবণ? হতে পারে না। পারবে না। রামও হতে চায় না। কাজলও সীতা নয়। কিন্তু পাখিটা—

পরমুহূর্তে হাতের মরা পাখিটার দিকে সে তাকাল। আঃ মেরে ফেললে সে? এমন নিরীহ জীবটাকে অবলীলাক্রমে মেরে ফেললে! কি করে মারলে? কিন্তু একি? অকস্মাৎ তার একি হলো! হু-হু করে জল বেরিযে আসছে। অজস্র অশ্রু। একটা ছোট পাখির এত রক্ত?

ওদিকে বাইরে একটি ক্যাঁচ শব্দ উঠল। বেরিয়ে যাচ্ছে সে। সে ডাকলে- —কাজল! কাজল! আবেগ যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে ধরা গলায় উঠছে বুকের মধ্যে।

—আনন্দ।

দরজা খুলে দিলে আনন্দ। কাজল বাইরে দাঁড়িয়ে।

—তুমি কাঁদছ আনন্দ!

—পাখিটাকে মেরে ফেললাম কাজল।

—তার জন্যে কাঁদছ?

—কাঁদছি।

অবাক হয়ে গেল কাজল। কি বলবে ভেবে পেলে না।

আনন্দ চোখ মুছে বললে—শোন।

—কি?

—তুমি বাড়ি যাও কাজল এখন। না। চল আমি তোমার সঙ্গে তোমার মায়েব কাছে যাই। তোমায় চেয়ে নিয়ে আসি। আমাকে তুমি বিয়ে কববে তো কাজল? বন্ধুত্ব নয়। বিয়ে। যে বিয়েতে মৃত্যু পর্যন্ত বিচ্ছেদ নেই।

কাজল এবাব কেঁদে ফেলল। নীবব অশ্রু। দবদব ধাবায তার সাবা মুখ ভেসে যেতে লাগল। আনন্দ কি বিচ্ছেদহীন মিলনেব কল্পনায় বিভোব হযে উঠেছে!